ইসলামে সামাজিক জীবন

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ইসলামে সামাজিক জীবন

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

ইসলামে সামাজিক জীবন

লেখক:
হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

ইসলামে সামাজিক জীবন

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্বঃ অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশঃ পহেলা রমজান, ১৪৪৪ হিজরী
২৪শে মার্চ, ২০২৩ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ৫ই জানুয়ারী, ২০২৫ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

কম্পিউটার কম্পোজঃ এম এম রহমান

হাদিয়াঃ ১৮০ (একশত আশি) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks
যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com
বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

ISLAME SAMAJIK JIBON WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 24th MARCH, 2023 ISAYI, RAMADAN 1st, 1444 AH HIJRI.

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েকজন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ্য: ‘গাঁওপাড়া’ গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

✍ সামাজিক জীবন:

মানুষের ব্যক্তি জীবন-পারিবারিক জীবনের আলোচনার পর (১ম খন্ড অপ্রকাশিত) আলোচ্য বিষয় সামাজিক জীবন। সমাজকে সুন্দর ও সুস্থ ভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ﴿۳۶﴾

অর্থ: তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করো না এবং পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। আর যারা তোমাদের আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশি, কাছের-প্রতিবেশি, পাশের লোক, পথচারী ও তোমাদের দাস-দাসী তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৩৬)

শুধু এতটুকু নয়, ইসলামে প্রতিবেশির গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হযরত ইবনে উমার ও আয়েশা (রাঃ) তাঁরা উভয়েই বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, জিবরাইল (আঃ) আগমন করে আমাকে প্রতিবেশির বিষয়ে অবিরত উপদেশ দিতে লাগলেন। এমন কি আমার মনে হল, হয়ত তিনি অচিরেই প্রতিবেশিকে ওয়ারিস করে দিবেন। (রিয়াদুস সলেহীন ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৩, হা: ৩০৩; ছহীহ বুখারী ও মুসলিম)

একটু ভেবে দেখুন প্রতিবেশির প্রতি ইসলাম কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনি নিজে ঈমানদার দাবি করবেন আর একই সাথে আপনি আপনার প্রতিবেশিকে কষ্ট দিবেন, তা কখনই হবার মত নয়। বর্তমান সময়ে দেখা যায় এমন মানুষ আছে যারা মসজিদে গিয়ে জামায়াতে ছলাত আদায় করে, রমাদান মাসে ছিয়াম পালন করে, যাদের অর্থ আছে তারা হাজ্জও আদায় করে। আবার সেই হাজি সাহেবের জমিনে তার গরিব প্রতিবেশীরা যখন চলাচল করে, কোন গরু-ছাগল রাখে অথবা বসবাসের জন্য একটু আশ্রয় নেয়। তখন সেই গরিব প্রতিবেশীর

প্রতি রীতিমতো সকল প্রকার কঠোরতা প্রদর্শন করে। তাদের প্রতি মুখ দ্বারা, কর্ম দ্বারা জুলুম করতে থাকে। অথচ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, এক প্রতিবেশি যেন নিজের প্রাচীরে অপর প্রতিবেশিকে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪, হা: ৩০৭; ছহীহ বুখারী ও মুসলিম)

নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন আর নিজেকে মু'মিন দাবি করবেন তা কখনও হবার নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, বলা হলো ইয়া রসূলল্লাহ সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪, হা: ৩০৫)

আপনি আপনার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন তা তো হবেই না, বরং আপনি আপনার গরিব প্রতিবেশীকে রেখে নিজে ভালো খাবার খাবেন অথচ আপনার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকবে তাও হবে না। হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, হে আবু যার! যখন তুমি তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে একটু বেশি পানি দাও এবং তোমার প্রতিবেশীর খবর নাও। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪, হা: ৩০৭; মুসলিম)

ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে নসিয়ত করলেন; যখন তুমি ঝোল পাকাবে তখন তাতে অধিক হারে পানি দাও। এরপর নিজের প্রতিবেশীর ঘরের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদেরকে এ ঝোল হতে নিয়মানুযায়ী কিছু দাও। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৪) ইসলাম আপনাকে আপনার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। কেন আপনি আপনার প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ করবেন? হযরত আবু শুরাইহ আল যুনাঈ (রাঃ) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ও

পরকালের প্রতি বিশ্বাসী সে অবশ্যই প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৫, হা: ৩০৯)

কোন পুরুষের জন্য উচিৎ নয়, অন্য কোন নারী বা পুরুষের নামে গীবত করা। অনুরূপ ভাবে কোন নারীরও উচিৎ নয় কোন পুরুষ বা নারীর নামে গীবত করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

অর্থ: দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনে-পেছনে মানুষের) নিন্দা করে। (সূরা হুমাযাহ, আয়াত: ১)

তবে যদি কোন অসহায় মানুষের প্রতি কোন ক্ষমতাবান মানুষ যুলুম করে। সেই অসহায় মানুষটি জালিমের কথা মানুষদের নিকট বলতে পারবে। যেন অন্য মানুষ ঐ জালিম থেকে সতর্ক হয় অথবা সেই অসহায় মাজলুম মানুষটিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা মন্দ প্রচারনা পছন্দ করেন না। তবে যে ব্যক্তির উপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ তা'য়ালা ভালো ভাবেই শোনেন এবং জানেন। (সূরা নিসা, আয়াত: ১৪৮)

আপনি যখন আপনার কোন প্রতিবেশীর নামে মন্দ প্রচারণা করবেন তখন সেই ব্যক্তি আপনার নামেও মন্দ প্রচারণা করবে। এতে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেবে এমন কি মারা-মারি, খুন-খারাবি হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজেই সমাজে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি কেবল ইসলামে শিখানো পন্থায় করা সম্ভব।

সামাজিক জীবনে চলার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের ৬টি হক রয়েছে।

১. কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে।

২. দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে।

৩. পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে।

৪. হাঁচি দিলে আল-হামদুলিল্লাহ পড়বে ও তার জবাব দেবে (ইয়ার হামুকাল্লাহ বলবে)।

৫. অসুস্থ হলে তার কাছে গিয়ে খোজ-খবর নিবে।

৬. সে ইন্তেকাল করলে তার জানাযা ছলাতে অংশ গ্রহণ করবে। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৪৩৭; মুসলিম, হা: ২১৬২; বুখারী, হা: ১২৪০; তিরমিযী, হা: ২৭৩৭; নাসায়ী, হা: ১৯৩৮; আবু দাউদ, হা: ৫০৩০; ইবনু মাজাহ, হা: ১৪৩৫; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৭১৫৫)

অন্য এক হাদিসে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কছম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশী বা (দ্বীনি) ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৪৫৮; ছহীহ বুখারী, হা: ১৩; মুসলিম, হা: ৪৫; নাসাই, হা: ৫০১৬; তিরমিযী, হা: ২৫১৫; ইবনু মাজাহ, হা: ৬৬; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১১৫৯১, ১২৩৮৮; দারেমী, হা: ২৭৪০)

অন্যথায় হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কোন সৎ কাজকেই তুচ্ছ মনে করনা, যদিও সেটা তোমার কোন (মুসলিম) ভাই এর সাথে আনন্দের সাথে সাক্ষাৎকার হয়। (এটাকেও সৎ কর্মের দিক থেকে তুচ্ছ মনে করা উচিৎ নয়)। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৪৬৩; মুসলিম, হা: ২৬২৬; তিরমিযী, হা: ১৮৩৩; ইবনু মাজাহ, হা: ৩৬৬২; দারেমী, হা: ২০৭৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মাল-ধন (খয়রাত) দ্বারা তোমরা ব্যাপকভাবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু মুখমন্ডলের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা এবং চরিত্র মাধুর্য্য দ্বারা ব্যাপকভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৫৩৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- হে মুসলিম রমনীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার কোন প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ মনে না করে। এমন কী বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হাদিয়া প্রেরণ করলেও নয়। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পু: ১৮৪, হা: ৩০৬; ছহীহ বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদিস থেকে ২টি বিষয় শিক্ষণীয়-

১. প্রতিবেশী নারীগণও একে অপরকে ব্যাপক হারে হাদিয়া প্রদানের প্রচলন চালু করবে। কেন'না তাতে সমাজের শৃংখলা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়।
২. গরিব স্ত্রীলোকও তার প্রতিবেশী ধনী স্ত্রীলোকদেরকে হাদিয়া প্রদান করতে পারবে সাধ্য অনুযায়ী। এতে হাদিয়া যদি সামান্য মূল্যেরও হয় তবুও তা হাসি মুখে গ্রহণ করতে হবে। ফলে সমাজের ধনী-গরিব সকলের মাঝে একটা উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যার কারণে উভয়ে পরস্পরের সহযোগী হিসেবে সমাজে বসবাস করবে। প্রতিবেশির দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।

অন্যথায় হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন পুরুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ৪টি-

১. দ্বীনদার স্ত্রী
২. প্রশস্থ বাসস্থান
৩. সৎ প্রতিবেশি
৪. আরাম দায়ক বাহন

আর ৪টি জিনিস অকল্যাণ কর-

১. অসৎ প্রতিবেশী

২. অসতী স্ত্রী

৩. সংকীর্ণ বাড়ি

৪. খারাপ বাহন।

(ইবনে হিব্বান, হা: ৪০৩২; সিলসিলাহ সহীহ, ২৮২)

আপনি যদি অর্থ সম্পদশালী না হন, তবে আপনার সাধ্য অনুযায়ী আপনার প্রতিবেশিকে হাদিয়া দিবেন। কেননা মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

অর্থ: আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশি রয়েছে এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন উভয়ের মধ্যে যার ঘরের দ্বার তোমার অধিক নিকটবর্তী। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৫, হা: ৩১০; ছহীহ বুখারী)

অন্য এক হাদিছে বর্ণিত হয়েছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমার প্রতিবেশি কারা? আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমার আশে-পাশের ৪০ ঘর তোমার প্রতিবেশি।

✍ সমাজে ঘৃণিত কিছু কর্ম যা অবশ্যই বর্জনীয়:

সমাজ জীবনে বসবাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই রয়েছে অশ্লিল ভাষী যা সমাজকে দূষণ করে আর তা থেকে বাদ পড়ে না অনেক নামাজি বা ইসলাম প্রিয় ব্যক্তিরাও। আর তা হলো সাধারণ কথাতেও হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে আপনজনকে সালা, সমুন্দী, সালার বেটা বা সালার বেটা সালা ইত্যাদি। এই সকল ভাষাগুলো হাসতে হাসতে ব্যবহার করাও নিন্দনীয় ও গোনাহের কাজ। কেননা, এই কথা গুলোই মানুষকে রাগের সময় ব্যবহার করা হয়।

আপনি উপরে উল্লেখিত বাক্যের ভাষাগুলো কাউকে রাগের সময় ব্যবহার করেন অথবা এমনিতেই হাসি-ঠাট্রা করে বলেন, দুটোই গুনাহের কাজ। কেননা কাউকে আপনি সালা বললেন অথচ সে আপনার শ্যালক নয়, তবে তাকে সালা বা শ্যালক বলাটা আপনার মিথ্যা কথা। যা গুনাহের কাজ আর হাসি ঠাট্রা করে বললেও কথাটি মিথ্যা হবে এবং অনর্থক হবে আর মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো অনর্থক কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾

অর্থ: যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ৩)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষের ইসলামের উত্তম নিদর্শন হল যা তার উপকারে আসে না এমন বক্তব্য ও কর্ম পরিহার করা। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ৬৩. হা: ৬৭; তিরমিযী)

যদিও বিতর্কের খাতিরে হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে কাউকে গালি দেওয়াকে সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার ভেবে নিচ্ছেন, আসলে সেটাও সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার নয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তোমরা এমন সব কর্ম করে ফেল যে সব তোমরা একে বারে তুচ্ছ মনে কর, কিন্তু আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর জামানায় সে সবকে ধ্বংসকারী হিসেবে গণ্য করতাম। (রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড, পৃ: ৬০, হা: ৬৩; ছহীহ বুখারী)। আর রাগের মাথায় কারো সাথে ঝগড়া করে গালা-গালি করা তো

আরো ডাবল গুনাহ কেননা এমনি সে কথাগুলো মিথ্যা-অনার্থক। তার উপর আবার কাউকে গালি দেয়া আর ঝগড়া করে কাউকে গালি দেয়াকে মুনাফিকের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, ৪টি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়।

১. আমানতের খিয়ানত করে।

২. কথা বললে মিথ্যা বলে।

৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে।

৪. ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাবে গালি-গালাজ করে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮; মুসলিম,হা: ৫৩; তিরমিযী, হা: ২৬৩২; নাসায়ী, হা: ৫০২০; আবু দাউদ, হা: ৪৬৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৭২৯, ৬৮২৫)

অন্য এক হাদিসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি এবং তাকে হত্যা করা কুফুরী। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৪৮৭; ছহীহ বুখারী, হা: ৪৮, ৭০৭৬, ৬০৪৪; মুসলিম, হা: ৬৪; তিরমিযী, হা: ১৯৮০, ২৬৩৪, ২৬৩৫; নাসায়ী, হা: ৩১০৫, ৪১০৬, ৪১০৮; ইবনু মাজাহ, হা: ৬৯, ৩৯৩৯; মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩৬৩৯, ৩৮৯৩)

আবার অনেক সময় সমাজে দেখা যায় একজন অপরজনকে এতো অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়, যা কোন মুসলমানদের মুখে শোভনীয় নয়। আর এই সকল অশ্লীল ভাষীকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘৃণা করেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা অশ্লীল ভাষী, নির্লজ্জ ইতরকে ঘৃণা করে থাকেন। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৫০২; তিরমিযী, হা: ২০০) অন্যথায় হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, মুমিন তিরষ্কারকারী,

অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতর প্রকৃতির হয় না। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৫০৩; তিরমিযী, হা: ১৯৭৭; মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩৮২৯, ৩৯৩৮)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে অতি ঝগড়াটে লোক। (বুলুগুল মারাম,হা: ১৫১৮; ছহীহ বুখারী, হা: ২৫৬৮; তিরমিযী, হা: ২৯৭৬; নাসায়ী, হা: ৫৪২৩; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৩৭৫৬, ২৩৮২২)

অনেক মানুষ আছে যারা রাগের মাথায় অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধারণ ভাবেও একজন অপর জনকে সম্মোধন করে গালি দেয়, অথচ কোন অবস্থাতেই একজন অপর জনের পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বিন আস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। জিজ্ঞিস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কি ভাবে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন যে, অন্যের পিতাকে গালি দেয় তখন সে তার পিতাকে গালি দেয়, এবং যে অন্যের মাতাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাতাকে গালি দেয়। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৪৬০; ছহীহ বুখারী, হা: ৫৯৭৩; মুসলিম, হা: ৯০; তিরমিযী, হা: ১৯০২; আবু দাউদ, হা: ৫১৪১; মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৪৯৩, ৬৮০১)

শুধু তাই নয়, গালি দাতা যাকে গালি দেয় সেই অত্যাচারের স্বীকার ব্যক্তিটি যদি পুনরায় প্রথম ব্যক্তিকে গালি দিয়ে সীমালংঘন না করে, তবে গালিদাতার উপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, গালি দাতাদের মধ্যে প্রথম গালিদাতার উপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাতে থাকে। যতক্ষণ অত্যাচারিত দ্বিতীয় ব্যক্তি সীমালংঘন না করে। অর্থাৎ গালি দানে প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে না যায়। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৫০০; মুসলিম, হা: ২৪৮৭, ২৪৮৮; বুখারী, হা: ৪১৪১, ৪১৪৬)

অতএব, গালি বন্ধ করতে হবে। গালি সমাজ দূষিতকরণের অন্যতম একটি কারণ। এর মাধ্যমে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কষ্ট দেয়। এই গালি থেকে শুরু করে সমাজে বড় ধরনের কোন ক্ষতি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অথচ হযরত আবু ছিরমাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্ষতি করে প্রতিদানে আল্লাহ তা'য়ালাও তার ক্ষতি করবেন। আর যে, ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কষ্ট দেবে আল্লাহ তার প্রতিদানে তাকে কষ্ট দেবেন। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৫০১; আবু দাউদ, হা: ৩৬৩৫; তিরমিযী, হা: ১৯৪০; ইবনু মাজাহ, হা: ২৩৪২; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৫৩২৮)

উপরোক্ত হাদিসে আল্লাহর নাবী ﷺ প্রতিটি মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার নিষেধাজ্ঞা ক্ষেত্রে বলেছেন, যদি কেহ কোন মুসলমানকে কথা, কর্ম দ্বারা অথবা তার হক নষ্ট করে কষ্ট দেয় সে অবশ্যই বড় ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হবে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া বা হক নষ্ট করা আরো অধিক গুনাহের কারণ। আর প্রতিবেশির হক এর অন্যতম হলো প্রতিবেশির স্ত্রী। সমাজে অনেক সংবাদই পাওয়া যায় মানুষ তার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে পরকিয়া করেছে বা যেনায় লিপ্ত হয়েছে। সমাজে কিছু ঘৃণিত কর্মের মধ্যে এটিও একটি যা অবশ্যই বর্জনীয়, আর তা ঘৃণিত একটি কবিরাহ গুনাহ। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ? আমি বললাম তারপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে তোমার যেনা করা। (বুলুগুল মারাম, হা: ১৪৫৯; ছহীহ বুখারী, হা: ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০; মুসলিম, হা: ৮৬; তিরমিযী, হা: ৩১৮২, ৩১৮৩; নাসায়ী, হা: ৪০১৩, ৪০১৪, ১০১৫; আবু দাউদ, হা; ২৩১০; মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩৬০১, ৪০৯১)

অন্য এক হাদিসে হযরত মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) বলেন,আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য ১০ জন নারীর সাথে জিনায় লিপ্ত হওয়ার অপরাধ, তার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে জিনায় লিপ্ত হওয়ার অপরাধের চেয়ে কম পর্যায়ের। এমনি ভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেশির ঘর থেকে চুরি করার অপরাধ অন্য ১০টি ঘর থেকে চুরি করার অপরাধের চেয়ে জঘণ্য। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ৫৫৫৬)

জিনা এমন একটি ঘৃণিত অপরাধ যা সমাজে সংঘটিত হবার কারনে আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সমাজের মধ্যে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, যখনই কোন জাতির মধ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গের অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন তাদের মধ্যে খুন-খারাবী বেশী হবে। আর যে বংশের মধ্যে জিনা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে আল্লাহ তাদের উপর মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিবেন। যখন কোন জাতি যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিবে তখন তাদের উপর অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দিবেন। (সীলসীলায়ে সহীহাহ, হা: ১০৭)

উপরে উল্লেখিত হাদিস জিনার ভয়ারহতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, তাছাড়াও জিনা একটি সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ধ্বংসকারী জঘন্য কর্ম তা সাধারণ ভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়। অনুরূপভাবে সমাজে ঘৃণিত কিছু কর্মের মধ্যে মাদক সেবন অবশ্যই বর্জনীয়। মাদক সেবনকারী সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাদক সেবন করে ও নেশাগ্রস্থ হয় তার ৪০ দিনের নামাজ কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তাওবাহ করে; তবে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন। পুনরায় যদি সে মাদক সেবন করে ও নেশা গ্রস্থ হয়; তবে তার ৪০ দিনের নামাজ কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় যদি সে মাদক সেবন করে; তবে তাকে কিয়ামত দিবসে 'রাদগাতুল খাবাল' পান করানো আল্লাহর জন্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। সাহাবীগণ বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ!

‘রাদগাতুল খাবাল’ কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহ থেকে বের হওয়া পুঁজ-রক্ত। (সুনানে ইবনু মাজাহ, হা: ৩৩৭৭)

মাদকের পরিচয় সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু মাদক আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। (বুলুগুল মারাম, হা: ১২৪৮; ছহীহ বুখারী, হা: ৫৫৭৫; মুসলিম, হা: ২০০৩; তিরমিযী, হা: ১৮৬৯; নাসায়ী, হা: ৫৬৭১, ৫৬৭৩, ৫৬৭৪; আবু দাউদ, হা: ৩৬৭৯; ইবনু মাজাহ, হা: ৩৩৭৩, ৩৩৯০; মুসনাদে আহমাদ, হা: ৪৬৩০, ৪৬৭৬, ৪৭১৫; মুয়াত্তা মালেক, হা: ১৫৯৭; দায়েমী, হা: ২০৯০)

অতএব যে সকল বস্তুগুলো দ্বারা নেশা সৃষ্টি হয় সেই সকল বস্তুকেই মাদক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান সময়ে আবার বিভিন্ন রকমের মাদক তৈরি হয়েছে সেই সকল মাদকের আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে নাম করণ করা হয়েছে। যেমন- হেরোইন, ইয়াবা, গাজা, তাড়ি, চুয়ানি, বিয়ার, ড্রাগ, হুইস্কি, ভদকা, আফিম, শ্যাম্পেন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, শিশা, কোকেন ইত্যাদি।

মাদকের এই সকল বিভিন্ন নাম করণ সম্পর্কে আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের কিছু লোক মাদক সেবন করবে, তারা সেটার ভিন্ন নামকরণ করে নেবে। (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৩৫৮৮; ইবনু মাজাহ, হা: ৪০২০)

মাদকের এই নামকরণ সম্পর্কে অত্র হাদিসের আলোচনায় শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত নাম পাল্টিয়ে মাদক সেবনকারী মুসলিমও বর্তমান জামানায় প্রকাশ পেয়েছে। তারা সেটার নাম দিয়েছে ‘রুহানি টনিক’ বা ‘জীবন সুধা’। অথচ এটা নিছক মিথ্যার উপর প্রলেপ প্রদান ও প্রতারনা মাত্র। এ সমস্ত প্রতারকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

অর্থ: তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে, অথচ তারা যে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছে তারা তা অনুধাবন করতে পারছে না। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৯)

বর্তমান সমাজে বিড়ি, সিগারেটও মাদক হিসেবে চিহ্নিত। কেননা এটাও সেবন করার ফলেও মানুষ এটার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। এমনকি বিড়ি, সিগারেট একটি হারাম বস্তু, যা সেবন করাও হারাম।

✍ যে কারনে বিড়ি, সিগারেট খাওয়া হারাম:

বিড়ি সিগারেট পান করা কয়েকটি কারনে হারাম। যদিও আমি সেই বিষয়টি মূল আলোচনায় রাখিনি, তবুও একটি কারণ উল্লেখ করছি তা হলো- সিগারেটের প্যাকেটের উপরে যে ছবিটি দেয়া থাকে সেটাই সিগারেট হারাম হবার একটি দৃষ্টান্ত মূলক প্রমাণ। আর তা হলো ধুমপানের কারনে স্টোক হয়, ক্যান্সার হয়। এই ধুমপান ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ اَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَی التَّهْلُكَةِ ۚۖۛ وَ اَحْسِنُوْا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۹۵﴾

অর্থ: তোমরা নিজেরা নিজেদেরকেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিওনা। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৫)

আর তাছাড়া ধুমপান এমন একটি খাদ্য যা ক্ষুধা নিবারণ করেনা এবং পুষ্টিও যোগায় না, যা জাহান্নামীদের খাদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَّا یُسْمِنُ وَ لَا یُغْنِیْ مِنْ جُوْعٍ ﴿۷﴾

অর্থ: এ খাবারটি তাদের পুষ্টি যোগাবেনা এবং তা দ্বারা ক্ষুধাও নিবারণ হবে না। (সূরা গাশিয়া, আয়াত: ৭)

আর এই বিড়ি, সিগারেট ক্রয় করার মাধ্যমে অর্থ অপচয় হয়। অর্থ অপচয় কারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

অর্থ: যাহারা অপচয় করে তাহারা তো শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালক এর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৭)

তাছাড়াও ধূমপান কারীদের শরীর ও মুখ থেকে এতো দুর্গন্ধ বের হয় যে, তা দ্বারা তার পাশের মানুষ কষ্ট পায়।

বিড়ি সিগারেটের মতো সেই সকল জর্দাগুলোও মাদক। যেই সকল জর্দা গুলোও খাওয়ার কারনে সাধারণ মানুষদের মাথা ঘুরায় এবং নেশা সৃষ্টি করে। অনেকেই আবার বলে থাকে জর্দা বা গুল বেশি খেলে সমস্যা দেখা দেয়, কিন্তু কম খেলে কিছুই হয় না। সুতরাং কম খাওয়া যাবে। অথচ হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে বস্তুর অধিক পরিমান ব্যবহারে নেশা আনে ঐ বস্তুর অল্প ব্যবহারও হারাম। (বুলুগুল মারাম, হা: ১২৪৯; তিরমিযী, হা: ১৮৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৪২৯৩; আবু দাউদ, হা: ৩৬৮১; ইবনু মাজাহ, হা: ৩৩৯৩)

অতএব যারা বিড়ি, সিগারেট, জর্দা-গুল খাওয়া হারাম না বলে বিভিন্ন যুক্তি দিচ্ছে এবং ঐ সকল বস্তু ভক্ষণ করছেন। তাদের জন্য অবশ্যই ওই গুলোর পক্ষে যুক্তি তর্ক ছেড়ে দেয়া উচিৎ। কেননা, প্রকৃতই যদি এই বস্তুগুলি হারাম হয় তবে আপনাদের গোনাহগার হতে হবে।

১. আপনি হারামকে হালাল করার চেষ্টা করছেন।
২. সেই হারাম বস্তু আপনি ভক্ষণ করেছেন।
৩. আপনার কথার উপর ভিত্তি করে সাধারণ মানুষও হারাম বস্তুকে হালাল মেনে ভক্ষণ করেছে।

৪. আপনি অপচয়কারীদের মধ্যে শামিল। যাকে আল্লাহ তা'য়ালা অভিশপ্ত শয়তানের ভাই বলে কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আর যদি ঐ সকল উল্লেখিত বস্তু হারাম না হয় তবে আপনি কোন নেকি পেলেন না। আপনার কোন গোনাহ হলো না ঠিকই কিন্তু আপনি অপচয়কারীদের মধ্যে শামিল। যা আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন।

অতঃপর এক হাদিছে হযরত আবু বারযা আসলামী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে নিজ স্থানেই দাড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না সে (কয়েকটি বিষয়ে) .... হবে তার মধ্যে একটি হলো- সে কোন পথে অর্থ উপার্জন করেছে এবং তা কোন পথে ব্যয় করেছে। (রিয়াদুস সালেহিন, ২য় খন্ড, পৃ: ১৯, হা: ৪০৮; তিরমিযী)

অতএব এমনো হতে পারে যে, এই অর্থ অপচয় করার কারনেও আপনি হাশরের মাঠে আটকে যেতে পারেন। আর তাছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ এর এই বানিটিও ঐ সকল বস্তুকে মাদক বলে ঘোষণা করে দিয়েছে এবং হারাম বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মাদক আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টি কারী বস্তুই হারাম। (বুলুগুল মারাম, ১২৪৮; বুখারী, হা: ৫৫৭৫; মুসলিম, হা: ২০০৩; তিরমিযী, হা: ১৮৬৯; নাসায়ী, হা: ৫৬৭১)

আবার অনেকেই বলে থাকে, যে সকল বস্তুগুলোকে মদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আমরা তা মূলত নিজেদের চিকিৎসার জন্য ভক্ষণ করি। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যেমন- ধুমপান করলে মনে প্রশান্তি আসে চিন্তা দুর হয়। জর্দা-গুল ইত্যাদি খাইলে দাঁতের মাড়ির ব্যাথা দুর হয়। তাছাড়াও প্রত্যেক মাদক দ্রব্যরই কোন না কোন চিকিৎসার কথা তারা বলে থাকে। অথচ এই মাদক দ্রব্য দ্বারা কতোটুকু চিকিৎসা হয় তা আল্লাহর রসূল ﷺ স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়ায়িল আল হাযরামী হতে বর্ণিত- তারিক ইবনু সুওয়াইদ (রাঃ) মাদক দিয়ে

ঔষধ তৈরি করা প্রসঙ্গে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে তিনি ﷺ বলেন, এটাতো ঔষধ নয় বরং ব্যাধি। (বুলুগুল মারাম, হা: ১২৫২; মুসলিম, হা: ১৯৮৪; তিরমিযী, হা: ২০৪৬; আবু দাউদ, হা: ৩৮৭৩; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৮৩১০, ১৮৩৮০, ২৬৫৯৬)

✍ মাদক সেবনকারীদের অবস্থা:

মাদক সেবনে মানুষের শুধু ইহজীবনই ধ্বংস হয় না, বরং পরকালিন জীবনও ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব মাদক সেবন এমন একটি গোনাহ যা আপনাকে ইহকালিন জীবন থেকে বিপদ গ্রস্থ করে ফেলবে আর পরকালিন বিষয় তো আরো ভয়াবহ। কেননা, হাদিসে এই মাদককে সকল পাপের চাবিকাঠি বলে উল্লেখিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মাদক সেবন থেকে বেঁচে থাক। কারণ তা সকল পাপের চাবিকাঠি। (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০২, হা: ২৫)

অন্যথায় মাদক সেবনকে সর্বাপেক্ষা কবিরা গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ রসূল ﷺ এর ইনতেকালের পর একবার আবু বকর, উমার এবং কিছু সংখ্যাক সাহাবী একটি বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বসেন। তাঁরা সর্বাপেক্ষা কবিরাহ গুনাহ কী আলোচনা করে জানতে চাইলেন। অথচ তাঁদের কেউ তা জানতেন না। তখন তাঁরা আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, সর্বাপেক্ষা কবিরাহ গুনাহ হলো মাদক সেবন করা। এরপর আমি এ সংবাদ নিয়ে তাঁদের কাছে এলাম। এ বিষয়ে তাঁরা তাঁকে বার বার প্রশ্ন করতে থাকেন এবং সবাই তাঁর নিকট ভিড় করলেন এবং তাঁর ঘরে একত্রিত হলেন। তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর রসূল ﷺ এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, একজন বনী ইসরাঈলী বাদশাহ এক অপরাধীকে এই বলে ইখতিয়ার দিলেন যে, হয় সে মাদক সেবন করবে, নতুবা কাউকে হত্যা করবে

অথবা যেনা করবে অথবা শুকুরের মাংস খাবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। তখন লোকটি মাদক সেবন করা বেছে নিলো। যখন সে মাদক সেবন করল, তখন তারা যা চেয়ে ছিলো উল্লেখিত পাপের কোনোটিই তার জন্য বাধা হলো না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি মাদক সেবন করলে তার ৪০ দিনের ছলাত কবুল করা হয় না। কারো পেটে সামান্য মাদক থাকা অবস্থায় মৃত্যু হলে, অবশ্যই তার জন্য একারণে জান্নাত হারাম। মাদক সেবনের ৪০ দিনের মধ্যে মাদক সেবনকারী মৃত্যুবরণ করলে, সে প্রকৃত পক্ষে জাহিলিয়াতের উপরেই মৃত্যুবরণ করল। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, হা: ২৮)

অন্য এক হাদিছে হযরত উসমান ইবনে আফজাল (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সঃ কে বলতে শুনেছি তোমরা পাপের মূল (উম্মুল খবাইস) থেকে বেচে থাকো। যেহেতু তোমাদের পূর্বে জনৈক ব্যক্তি মানুষের সঙ্গ বর্জন করে একাগ্রচিত্তে এবাদতে মশগুল ছিল। জনৈক নারী তার পেছনে লেগে গেল। এরপর উক্ত মহিলা তার খাদেমকে এই বলে (ঐ আবেদের কাছে) পাঠাল যে, আমি আপনাকে একটি সাক্ষ্য দানের জন্য আহব্বান জানাচ্ছি। এরপর লোকটি সেখানে প্রবেশ করল যখন যে একটি দরজা অতিক্রম করে, তখন সে তার পেছনের দরজা বন্ধ করে দেয়। অবশেষে সে বসা এক সুন্দরী রমনীর নিকট উপস্থিত হলো। মহিলাটির নিকট একটি শিশু ও একপাত্র মদ ছিল। সে বলল আমি আপনাকে কোন সাক্ষ্যদানের জন্য আহব্বান করেনি। মূলত আমি এই শিশুকে হত্যা করার জন্য আপনাকে ডেকেছি অথবা আপনি আমার সাথে যেনায় লিপ্ত হবেন। অথবা আপনি একপাত্র মাদক সেবন করবেন। যদি আপনি এর কোনটিই গ্রহণ না করেন তবে আমি উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে আপনাকে লাঞ্ছিত করব। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, এরপর যখন সে দেখল যে, তার কোন একটি গ্রহণ করা ব্যতিত উপায় নেই তখন সে বলল, তুমি আমাকে এক পাত্র মাদক সেবন করাও। পরে সে তাকে মাদক সেবন করাল। মাদক সেবন করে সে বলল, তুমি আমার কাছে এসো।

এরপর সে তার সাথে যেনায় লিপ্ত হলো এবং শিশুটিকে হত্যা করল। কাজেই তোমরা মাদক সেবন থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহর শপথ! দুটি বস্তু একই ব্যক্তির বক্ষে একত্র হতে পারে না। একটি হলো ঈমান অপরটি হলো মাদক সেবনে অভ্যস্ত হওয়া। সহসা একটি অপরটিকে বের করে দেয়। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০৪, হা: ২৯)

অন্যথায় হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি আদম (আঃ) কে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হলো, তখন ফেরেস্তাগণ বললেন, হে প্রভু! আপনি এমন জাতি এখানে পাঠালেন যারা এখানে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তাপাত করবে অথচ আমরাই তো আপনার তাসবিহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা বর্ণনা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানোনা। তারা বলল বানী আদম হতে আমরা আপনার অধিক অনুগত। আল্লাহ ফিরিস্তাদের বললেন, তোমরা আমার কাছে দু'জন ফিরিস্তা উপস্থিত কর। তারা কি করে, আমি তা (পরীক্ষা করে) দেখব। তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! হারুত ও মারুত। তিনি বললেন, তোমরা দু'জন পৃথিবীতে যাও। যাহরা নামী এক উচ্চ বংশীয়া অনিন্দ্য সুন্দরী রমনী তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা উভয়েই তার কাছে প্রেম নিবেদন করল। সে অস্বীকার করে বলল, আল্লাহর শপথ, যতক্ষণে তোমরা আল্লাহর সাথে শিরকের শব্দ উচ্চারণ না করবে ততক্ষণে আমি তোমাদের আহবানে সাড়া দেব না। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর সাথে শিরক করব না। মহিলাটি তাদের নিকট থেকে চলে গেল এবং পুনরায় সে একটি শিশু কোলে নিয়ে ফিরে এলো। পুনরায় তারা তার কাছে প্রেম নিবেদন করল। সে বলল, এই শিশুটি হত্যা না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব না। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা একে কখনো হত্যা করব না। এরপর সে চলে গেলো এবং পুনারয় এক পেয়ালা নিয়ে উপস্থিত হলো। তারা পুনরায় তার কাছে প্রেম নিবেদন করল। সে বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা মাদক সেবন না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব না। পরে তারা মাদক সেবন করল

এবং উভয়ে নেশা গ্রস্থ হয়ে পড়লো। তখন তারা তার সাথে যেনায় লিপ্ত হয়ে পড়ল এবং শিশুটিকে হত্যা করল। পরে যখন তাদের হুশ ফিরে এলো, তখন মহিলাটি বলল আল্লাহর শপথ! তোমরা প্রথমত যে কাজ করতে অস্বীকার করেছিলে যা আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত করে ছিলাম। নেশা গ্রস্থ হয়ে তার সবগুলোই তোমরা করলে। অবশেষে তাদেরকে ইহকাল অথবা পরকালের শাস্তি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হলো। ফলে তারা দুনিয়ার শাস্তি বেছে নিলো। (আত তারগীর ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০৫, হা: ৩০)

উপরে উল্লেখিত হাদিছগুলো থেকে একথা স্পষ্ট যে, মাদক সেবন সকল পাপের চাবি কাঠি। যখন কোন ব্যক্তি মাদক সেবনে আসক্ত হয় তখন যাবতীয় গোনাহই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং একে একে সে সকল প্রকার গোনাহেই লিপ্ত হয়ে যায় কাজেই মাদক সেবন সমাজে ঘৃনিত কাজ আর অবশ্যই তা বর্জনীয়। আর এই মাদক সেবনকারী সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেছেন, জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশ বছরের রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে অথচ দান করে খোঁটা দান কারী, পিতা-মাতাকে কষ্ট দান করী এবং সর্বদা মাদক সেবনে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০১, হা: ২৩)

তাছাড়াও অন্য এক হাদিছে মাদক সেবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে মূর্তিপূজাকারী রূপে গন্য করা হয়েছে। হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলতেন, আমি একথায় কোন পরোয়া করিনা যে, মাদক সেবন করব অথবা আল্লাহ ছাড়া এই মূর্তিগুলোর পুজা করব। অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে উভয় কাজে সমান পাপ। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০০, হা: ২০; নাসায়ী)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মাদক সেবনে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি (তাওবাহ না করে) মারা যায় তবে সে মূর্তি পুজারীর ন্যায় আল্লাহর সাঙ্গে সাক্ষাত করবে। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, হা:

১৯; আল মু’জামুল কাবীর, ত্বাবারানী, হা: ১২৪৫; মুসনাদে আহমাদ; ইবনু হিব্বান)

হে পাঠক বন্ধু: অত্র আলোচনাটি একটি বার স্থির ভাবে ভেবে দেখুন। বিশেষ করে যেই সকল ভাই ও বোনেরা বিভিন্ন রকমের মাদক সেবনে আসক্ত হয়ে পড়েছেন এই মাদক আপনাদের ইহজীবন তো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেই সাথে সাথে পরকালিন জীবনটাও ক্ষতি ব্যতিত আর কিছুই থাকবে না। কাজেই এখনই আল্লাহর নিকট খাটি তওবাহ করে সে সকল মাদককে বর্জন করুন। তা যে ধরনেরই মাদক হোক না কেন। সর্বপ্রকার মাদক থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখুন।

হে মাদক সেবনকারী ভাই ও বোন! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন; আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন একদিন আপনাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আপনি ভেবে দেখুন, যেই মালিক আপনাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আবার তাঁর কাছেই আপনি কি নিয়ে উপস্থিত হবেন?

হে মাদক সেবনকারী ভাই ও বোন! আপনি কি জনেন, আপনার জন্য তাওবাহর দরজা এখনো উন্মুক্ত। আপনি তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আপনি খাঁটি তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু বোনাস থাকবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা ও মাদক সেবন বর্জন করবে, আমি অবশ্যই তাকে জান্নাতের ‘হাযিরাতুল কুদস’ নামক কুপের পানি পান করাব। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০৮, হা: ৩৯)

✍ সমাজের ঘৃণিত কিছু কর্মের মধ্যে এটিও একটি যে, কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ইচ্ছে মত আবার তাকে গ্রহণ করা যা অবশ্যই বর্জনীয়:

সমাজে অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর কোন কিছু নিয়ে মন-মালিন্য হলেই বা একটি ঝগড়া ফাসাদ হলেই অথবা স্ত্রীর কোন কিছু স্বামীর পছন্দ না হলেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, আবার নিজ ইচ্ছে মত স্ত্রীকে গ্রহণ করে নেয়। আর সংসারে ঝগড়া ফাসাদ হলে আবার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় আবার গ্রহণ করে। এভাবেই স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় আবার গ্রহণ করে। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿...﴾

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿...﴾

অর্থ: তালাক দুই বার। অত:পর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয় ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাহা প্রদান করিয়াছ তার মধ্যে হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে। অবশ্য যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারো কোন অপরাধ নাই। এইসব আল্লাহর সীমারেখা, তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা আল্লাহর এই সব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই জালিম। অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ্য হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সংগত না হইবে। অত:পর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা

আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তবে তাহাদের পুনরায় বিবাহে কাহারো কোন অপরাধ হইবে না। এই গুলি আল্লাহর বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯-২৩০)

জন সাধারনের বুঝার জন্য বাড়তি কোন কথা যুক্ত না করেই উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনে কাছির (রহিঃ) যেই আলোচনাটি করেছে তা হুবহু নিম্নে তুলে ধরলাম। ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিলো এই যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দাতের অর্থাৎ মেয়াদের মধ্যেই ফিরিয়ে নিত। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়ে ছিলো। স্বামী তাদেরকে তালাক দিত এবং ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিত। পুনরায় তালাক দিত। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এ ভাবে মাত্র ২টি তালাক দিতে পারবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আত্বোলা-ক্কু মাররোতা-ন অর্থ তালাক মাত্র ২ বার। তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবে না।

আবু দাউদে বর্ণিত রয়েছে যে, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে। (আবু দাউদ, হা: ২/৬৪৪) নাসাঈতেও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ কথায় বলেন। (নাসাঈ, হা: ৬/২১২)

মুসনাদ ইবনু আবী হাতীম গ্রন্থে রয়েছে- এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে রাখবও না, এবং ছেড়েও দিব না। স্ত্রী বলে, কি ভাবে? সে বলে তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার সময় হলেই ফিরিয়ে নেব। আবার তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় ফিরিয়ে নেব। এরূপ করতেই থাকব। ঐ মহিলাটি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করে। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইবনু আবী হাতিম ২/৭৫৪; তাবারী ৪/৫৩৯)

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর কোন অধিকার থাকল না এবং তাদেরকে বলা হল দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নিবে যদি তারা ইদ্দাতের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের এও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের ইদ্দাত অতিক্রান্ত হতে দিবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিবে না, যেন তারা নতুন ভাবে বিবাহের যোগ্য হয়ে যায়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেয়ারই ইচ্ছা কর তাহলে সদ্ভাবে তালাক দিবে। তাদের কোন হক নষ্ট করবে না, তাদের কোন ক্ষতি করবে না। হযরত আলী ইবনু আবী তালহা (রহি:) বলেন, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন কেহ তার স্ত্রীকে ২ বার তালাক দেয় সে যেন তার তালাক প্রদানের সময় আল্লাহকে ভয় করে। হয় সে তাকে তার কাছে রেখে দিবে এবং তার প্রতি দয়াগ্র হবে অন্যথায় তার প্রতি দয়া পরবশ হবে এবং তার কোন অধিকারকে বাধা গ্রস্থ করবে না। (তাবারী ৪/৫৪৩)

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, এই আয়াতে ২ তালাকের কথা বর্ণিত হয়েছে, ৩ তালাকের বর্ণনা কোথায় রয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আও তাছরিবহুন বিহ ছা-ন "সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে" এর মধ্যে রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯)

✍ মোহর ফিরিয়ে নেয়া:

স্ত্রীকে মহর দিয়ে বিবাহ করার পর আবার কোন কারণবশত: স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রীকে দেয়া মহর ফিরিয়ে নেয়া হারাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাহা (মহর) প্রদান করিয়াছ তার মধ্যে হইতে কোন কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য হালাল নহে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৩)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, অর্থাৎ মহরানা, অলংকার ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়েছে এসব জিনিসের কোনোটিই স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার স্বামীর নেই। কাউকে কিছু দান, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদান করার পর তা ফেরত চাওয়া এমনিতেই ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে। এ ধরনের ঘৃন্য তৎপরতাকে হাদিসে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, নিজে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দানকৃত বস্তু ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেলে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৪৩, হা: ১)

আর বিশেষ করে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় ইতিপূর্বে তাকে প্রদত্ত জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দেয়া একজন স্বামীর জন্য নিতান্ত লজ্জাজনক। অপর পক্ষে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে তাকে বিদায় দাও। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۴۱﴾

অর্থ: তালাক প্রাপ্ত নারীদেরকে যথারীতি অর্থাৎ ইদ্দাত পূর্তি পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৪১)

অত:পর যখন ৩য় তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তার জীবন সংকটময় করা এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা স্বামীর জন্য হারাম। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

অর্থ: তোমরা তাদেরকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু রেখে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিওনা। যদি না তারা স্পষ্ট ভাবে যেনা না করে। (সূরা নিসা, আয়াত: ১৯)

অতঃএব স্ত্রীর কাছ থেকে জোর পূর্বক কোন কিছুই রেখে দেয়া যাবেনা। কিন্তু যদি স্ত্রী স্পষ্ট ভাবে যেনায় লিপ্ত থাকে তবে ভিন্ন কথা। এ ছাড়া স্ত্রী যদি খুশি মনে কিছু দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে সেটাও আলাদা ব্যপার।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

অর্থ: তাহারা মোহরের কিয়দাংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করিবে। (সূরা নিসা, আয়াত: ৪)

✍ খোলা তালাক এবং মোহর ফিরিয়ে দেয়া:

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ বেড়ে যায় এবং স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে ও তার হক আদায় না করে, এরুপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু প্রদান করে তালাক গ্রহণ করে তাহলে তার দেয়ার এবং নেয়ার কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, স্ত্রী যদি বিনা কারনে তার স্বামীর নিকট খোলা তালাক প্রার্থনা করে তাহলে সে অত্যান্ত পাপী হবে। কখনো কখনো এমন হয় যে, মহিলারা কোন যথার্থ কারণ ছাড়াও বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায় এবং তালাকের জন্য বলতে থাকে। এ ব্যাপারে ইবনু জাবীর (রহি:) শাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, বিনা কারনে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম। (তাবারী ৫/৫৬৯; তিরমিযী ৪/৩৬৭) ইমাম তিরমিযী (রহি:) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মুয়াত্তা ইমাম মালিকে রয়েছে-হাবীবা বিনতু সাহল আন-সারিয়া (রাঃ) সাবিত ইবন কায়েস ইবনু শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের ছলাতের জন্য অন্ধাকার থাকতেই বের হন। দরজার ওপার হাবীবা বিনতু সাহল (রাঃ) কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি? তিনি বলেন আমি সাহলের কন্যা হাবীবা। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, খবর কি? তিনি বলেন, আমি সাবিত ইবনু কায়েস (রাঃ) এর স্ত্রী রুপে থাকতে পারি না। একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ নিরব হয়ে যান। অত:পর তার স্বামী সাবিত ইবনু কায়েস (রাঃ) আগমন করলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, হাবীবা বিনতু সাহল (রাঃ) কিছু বলেছে। হাবীবা বিনতু সাহল (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ সাবিত (রাঃ) কে বললেন, ঐগুলো গ্রহণ করো। সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ) তখন ঐগুলি গ্রহণ করেন এবং হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হয়ে যান। (মুয়াত্তা মালিক-২/৫৬৪; মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৩৩; আবু দাউদ-২/৬৬৭; নাসায়ী-৬/১৬৯)

অন্য এক হাদিছে রয়েছ সাবিত (রাঃ) স্ত্রী হাবীবা (রাঃ) এ কথাও বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমি তাকে চরিত্র ও ধর্মভীরুতার ব্যপারে দোষারুপ করছিনা, কিন্তু আমি তাকে ইসলামের মধ্যে কুফুরী করাকে (অর্থাৎ হাবীবার প্রতি সাবিতের দায়িত্ব পালন না করা) অপছন্দ করি। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কী তোমাকে দেয়া তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? মহিলাটি বলল, হ্যা। আল্লাহর রসূল ﷺ সাবিত (রাঃ) কে বললেন, বাগানটি ফেরত নাও এবং তালাক দাও। (ফাতহুল বারী-৯/৩০৬; নাসায়ী-৬/১৬৯)

✍ খোলা তালাকের ইদ্দাত:

রুবাই বিনতু মুওয়ায়িয ইবনু আফরা (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় খোলা তালকের জন্য অনুরোধ করে, আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে এক ঋতুকাল ইদ্দাত পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন। (তিরমিযী-৪/৩৬৩) অর্থাৎ যদি কোন নারী তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চেয়ে নেয় এবং তালাক প্রাপ্ত হয় তবে সেই নারী যদি আবার অন্য কোথাও বিবাহ করতে চায়, তবে সেই নারীকে অন্তত এক ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে বিবাহ করতে পারবে।

✍ একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া অবৈধ/হারাম:

ইমাম ইবনু কাসির (রহি:) উল্লেখ করেন যে, অন্য ঐ সকল মনীষীগণ এর মত ইমাম মালিক (রহি:) তাঁর অনুসারীদেরও এটাই মত যে, এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়া হারাম। তাদের মতে সুন্নাত পন্থা এই যে, তালাক একটি একটি করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

অর্থ: তালাক দু'বার। অতঃপর বিধি মোতাবকে রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদরে জন্য হালাল নয় যে তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নিবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারখোয় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়মে রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই জালিম। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২২৯)

এগুলি আল্লাহর সীমা, অতএব এগুলি অতিক্রম করো না। আল্লাহ তা’য়ালা এই আদেশকে সুনান নাসায়ীতে বর্ণিত নিম্নের হাদিস দ্বারা জোরদার করা হয়েছে। হাদিসটি এই যে, কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়। আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এই সংবাদ পৌছালে তিনি অত্যান্ত রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাবের সাথে খেল-তামাশা শুরু করলে? তখন একজন সাহাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন হে, আল্লাহর রসূল ﷺ আমি কি তাকে হত্যা করব? (নাসায়ী ৬/১৪২)

উক্ত আলোচনা থেকে এটাও প্রতীয়মান যে, যেহেতু একই বৈঠকে বা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হারাম। যেহেতু একই বৈঠকে যা একই সাথে তিন তালাক গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে তা এক তালাক বলে গন্য হবে।

✍ ৩য় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না:

সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতের আলোচনায় ইমাম ইবনে কাসির (রহিঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু’তালাক দেয়ার পর ৩য় তালাক দিয়ে ফেলবে তখন সেই স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না অন্য কেহ নিয়মনীতি মেনে তাকে বিবাহ করে সহবাস করার পর তালাক দিবে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে যে, সে যদি কোন লোকের সাথে সহবাস করে থাকে অথবা সে যদি দাসী হয় এবং তার মালিকের সাথে যৌন মিলন করে থাকে তথাপি তার পূর্ব স্বামীর সাথে (যে তাকে তিন তালাক দিয়েছে) বিবাহ বন্ধন আইন সিদ্ধ হবে না। কারণ যার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছে, সে তার বিয়ে করা স্বামী নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ২য় স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে, নাবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়; একটি লোক এক মহিলাকে বিবাহ করল এবং সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে

বিবাহিতা হলো, সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিলো। এখন কি তাকে বিবাহ করা তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, না, না। যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ না করে। (ফাতহুল বারী-৯/২৮৪; মুসলিম-২/১০৫৭)

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন- রিফাআহ আল কারাযীর (রাঃ) স্ত্রী আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয় যখন আমি এবং আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বলতে লাগল আমি রিফা'আহর স্ত্রী ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে তালাক দেয়, যা ছিলো অপরিবর্তন যোগ্য (তিন তালাক)। অত:পর আমি আব্দুর রহমান ইবনু যুবাইর (রাঃ) কে বিবাহ করি। কিন্তু তার গোপনাঙ্গ যেন একটি ছোট রশি, তার স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পুরণ করার ক্ষমতা নেই। অত:পর মহিলাটি তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ছোট রশি বের করে দেখায় (এটা বুঝানোর জন্য যে, সে কত অক্ষম)। খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনু আস (রাঃ) পাশের দরজার কাছে ছিলেন, যাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, হে আবু বকর! আপনি কেন ঐ মহিলাকে থামাচ্ছেন না যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে এ ধরনের খোলা মেলা কথা বলছে? আল্লাহর রসূল ﷺ একটু মুচকি হাসলেন এবং মহিলাকে বললেন, তুমি কি রিফা'আহকে আবার বিবাহ করতে চাও? কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করছ এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করছে। (মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৪; ফাতহুল বারী ১০/৫১৮; মুসলিম ২/১০৫৭; নাসায়ী ৬/১৪৬)

✍ বর্তমান সমাজে প্রচলিত চুক্তি ভিত্তিক হিল্লা বিয়ে এং তাতে অংশ গ্রহণকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ:

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ী ভাবে তাকে স্ত্রী রুপে রাখার উদ্দেশ্য হতে হবে। যদি উদ্দেশ্য থাকে এই যে, দ্বিতীয় বিবাহ করা হবে শুধু মাত্র প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবার

জন্য তাহলে এই ধরনের বিবাহ অবৈধ এবং হাদিছে এ ধরনের বিবাহতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এ ধরনের কথা উল্লেখ করে যদি কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়, তাহলে সেই চুক্তিও বাতিল বলে অধিকাংশ আলেম মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হাদিছে বর্ণিত রয়েছে- যে স্ত্রী লোক উলকী করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে নেয়, যে স্ত্রী লোক কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেয় এবং যে স্ত্রী লোক কৃত্রিম চুল লাগিয়ে নেয়, যে হালালা করে এবং যার জন্য হালাল করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের উপর আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ ১/৪৪৮; তিরমিযী ৪/২৬৮; নাসায়ী ৬/১৪৯)

ইমাম তিরমিযী (রহিঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) এর আমল এটার উপরেই রয়েছে। উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ) এবং ইবনু উমার (রাঃ) এর এটাই মত। তাবেঈ ধর্ম শাস্ত্রবিদগণও এটাই বলেন। আলী (রাঃ), ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) এরও এটাই উক্তি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সুদের সাক্ষ্য দানকারীর এবং লেখকের প্রতিও অভিশাপ। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং যারা যাকাত আদায় করার ব্যপারে ভালো সম্পদগুলোই আদায় করে অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে তাদের উপরেও অভিশাপ। একটি হাদিছে রযেছে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ধার করা ষাঁড় কে-তা কি আমি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ বলুন। তিনি বললেন যে, হালাল করে অর্থাৎ যে তালাক প্রাপ্ত নারীকে এ জন্য বিবাহ করে যেন সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার উপরও আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্য এটা করিয়ে নেয় সেও অভিশপ্ত। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এরুপ বিবাহ সম্বন্ধে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এটা বিয়েই নয়, যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক এবং বাহ্যিক হয় ভিন্ন এবং যাতে আল্লাহর

কিতাবকে নিয়ে খেল তামাশা করা হয়। বিবাহ তো শুধুমাত্র এটাই যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।

মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছেন। এরপর তার ভাই তাকে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করে যে, সে যেন তার ভাইয়ের জন্য হালাল হয়ে যায়। এই বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন, কখনো নয়। আমরা এটাকে নাবী ﷺ এর যুগে যেনার মধ্যে গণ্য করতাম। বিবাহ এটাই যাতে আগ্রহ থাকে। এ হাদিসটি মাওকুফ হলেও এর শেষের বাক্যটি একে মারফু'র পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এমন কি অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমিরুল মু'মিনিন হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন, যদি কেহ এই কাজ করে বা করায় তাহলে আমি উভয়কে যেনার শাস্তি দিব অর্থাৎ রজম করে দিব। (ইবনু আবী শায়বাহ-৪/২৯৪)

✍ তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলা কখন তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾

অর্থ: অত:পর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারো কোন অপরাধ হইবে না। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩০)

অতএব দ্বিতীয় স্বামী যদি বিবাহ ও সহবাসের পর তালাক দেয়, তাহলে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করলে কোন পাপ নেই, যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিবাহ শুধু প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিল না; বরং প্রকৃতই বিবাহ ছিলো। (তাবারী-৪/৫৯৮)

আর মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿...﴾

অর্থ: এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩০)

✍ তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে অভিভাবকের বাধা দেয়া উচিৎ নয়:

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿...﴾

অর্থ: তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দাতকাল পূর্ন করে, তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের (পূর্ব) স্বামীদেরকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদেরকে বাধা দিওনা। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহর ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্র তম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩২)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় ইমাম ইবনু কাসির (রহিঃ) বলেন, এই আয়াতে স্ত্রীদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীদেরকে বলা হচ্ছে যে, যখন কোন মহিলা তালাক প্রাপ্ত হয় এবং ইদ্দাতও অতিক্রম হয়ে যায় তখন যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হলে পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছা করে তাহলে যেন তারা তাহাদের বাধা না দেয়। আলী ইবনু আবী তালহা (রহিঃ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি ঐ লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার স্ত্রীকে একবার অথবা দুই বার তালাক দিয়েছে এবং স্ত্রীও তার ইদ্দাত শেষ করেছে। এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীকে

আবার ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেছে এবং স্ত্রীও ফিরে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার পরিবার তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাওযার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা তার পরিবারকে জানিয়ে দিলেন যে, এতে তাদের বাধা দেয়া উচিত নয়। মাসরুখ (রহিঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহিঃ), যুহরী (রহিঃ) এবং যাহ্হাক (রহিঃ) বলেন, যে এটাই আসলে এই আয়াত (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩২) নাযিল হওয়ার কারণ। (তাবারী-৫/২২,২৩)

উপরোক্ত আয়াতটি মা'কীল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) এবং তার বোন সমন্ধে অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, মা'কীল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমার নিকট আমার বোনের বিবাহের প্রস্তাব এলে আমি তার বিবাহ দিয়ে দেই। তার স্বামী কিছু দিন পর তাকে তালাক দেয়। ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় সে আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। আমি তা প্রত্যাখান করি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে মা'কীল (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ আমি তোমার সাথে আমার বোনের বিবাহ দেব না। এ শপথ সত্ত্বেও বলেন, আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। অত:পর তিনি তার ভগ্নিপতিকে ডেকে পাঠিয়ে পুনরায় তার সাথে তার বোনের বিবাহ দেন এবং নিজের কসমের কাফফারা আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৮৩২৫; ইবনু আবী হাতিম ২/৭৭৮; তাবারী ৫/১৭-১৯; বাইহাকী ৭/১০৪)

অত:পর বলা হচ্ছে এ সব উপদেশ ঐ সব লোকের জন্য যাদের শরীয়াতের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের ভয় করে। তাদের উচিৎ তারা যেন তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে এরুপ অবস্থায় বিবাহ হতে বিরত না রাখে, তারা যেন শরিয়াতের অনুসরণ করে এরুপ নারীদেরকে তাদের স্বামীদের হাতে সমর্পণ করে এবং শরিয়াতের পরিপন্থী নিজেদের মর্যাদাবোধ ও জিদকে শরিয়াতে পদানত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম।

(তালাক সম্পর্কিত আলোচনাটি সম্পূর্ণই ইমাম ইবনু কাসির (রহিঃ) এর তাফসীর ইবনু কাসির এর প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় খন্ড একত্রিত খন্ডের ৫৭৭-৫৮৭ পৃ: হইতে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এতে উল্লেখ তাফসীর গ্রন্থটি ছাড়াও কিছু কথা সংযুক্ত করা হয়েছে তবে তা খুবই সামান্য।)

✍ অন্যের জমি জবর দখল:

বর্তমান সমাজে অন্যের জমি জোর করে দখল করার নজিরও কম নয়। কেননা বরাবরই শাসকের শাসিতদেরকে শোষণ করতে চায় সমাজের নিরীহ অসহায় দুর্বল মানুষদেরকে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে অসহায় লোকদের সম্পদ দখল করাই যেন সমাজের বিত্তশালী বা ক্ষমতাসীন লাঠিয়ালদের একটি আনন্দ ও মনতৃপ্তির বিষয়।

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়ের মধ্যেই কলহ হলো জাহান্নাম বলে, আমার অভ্যন্তরে দাম্ভিক অহংকারী, বিত্তশালী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা জায়গা পাবে। জান্নাত বলল, আমার মধ্যে অসহায়, দারিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিরা স্থান পাবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিলেন; জান্নাত তুমি আমার রহমাত, তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা আমি দয়া করব। হে জাহান্নাম তুমি আমার আযাব। তোমার দৌলতে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। (রিয়াদুস সালেহিন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৬২, হা: ২৫৩; মুসলিম)

শায়েখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ বলেন, যখন মানুষের মন থেকে আল্লাহ ভীতি উঠে যায়, তখন তার শক্তি, বুদ্ধি সবই তার জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। সে এগুলোকে নির্বিচারে জুলুম-নিপীড়নে ব্যবহার করে। যেমন শক্তির বলে অন্যের সম্পদ দখল করা। ভূমি জবর দখল করা। (বই- যেসব হারামকে অনেকেই তুচ্ছ মনে করে, পৃ: ৭৪)

অথচ এমন অন্যায় ভাবে কারো জমি দখল করা মারাত্তক গুনাহের কাজ। হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো জমিনের কিছু অংশ আত্মসাৎ করবে, তার গলায় সাত স্তর জমীনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার ফরজ ও নফল কিছুই কবুল করা হবে না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৬, হা: ৪)

অন্য এক হাদিছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে এক বিঘাত পরিমান জমিনও আত্বসাৎ করবে, সাত স্তর জমিন তার গলায় লোটকিয়ে দেওয়া হবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৫, হা: ১)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে এক বিঘত জমিনও আত্বসাৎ করবে, তার গলায় সাত তবক জমিনের বেড়ী পড়িয়ে দেয়া হবে। ইমাম আহমাদ (রহিঃ) দু'টি সনদে এই হাদিস খানা উল্লেখ করেছেন, তবে একটি সনদ সহিহ মুসলিম এর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন যে, ব্যক্তি অন্যায় ভাবে এক বিঘত জমীনও আত্বসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার গলায় সাত তবক জমিন লটকিয়ে দেবেন। সাত তাবক জমিন লটকিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে শাস্তির বেড়ি পড়ানো হবে, মালার বেড়ি নয়। বরং কিয়ামতের দিন বেড়ি আকারে তার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, এর উদ্দেশ্য তাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে এবং আত্মসাৎকৃত জমি তার গলদেশে বেড়ির ন্যায় হবে।

আল্লামা বাগাবী (রহিঃ) বলেন, এই অভিমতটি সঠিত বিশুদ্ধ। সালিম (রহিঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, নাবী করিম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে এক বিঘত জমিনও আত্বসাৎ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন সাত স্তর জমিনের নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে। (আত তারহীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৫, হা: ২)

অন্য এক হাদিসে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো জমিন আত্বসাৎ করবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি হবেন তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। (আত তারীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ:২৭, হা: ৭)

অতএব সমাজের যে সকল বিত্তশীল মুসলিম ব্যক্তিগণ আল্লাহকে ভয় করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, বিচার দিবস সত্য। তাদের জন্য অবশ্যই উচিত যে, যদি কাহারো সম্পদ বা জমি অন্যায় ভাবে আত্বসাৎ করে থাকেন তবে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবাহ করা। শুধু জমি নয় এমনকি যদি শুধু মাত্র অন্যের জমিনের একটি আইল অন্যায়ভাবে দখল করে থাকেন তবে সেটাও ফিরিয়ে দিতে হবে। তা ব্যতীত আপনার প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার লা'নত বর্ষিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার উপর অভিশাপ করেন। (সহিহ মুসলিম, হা: ১৯৭৮)

✍ শ্রমিকের মজুরী আদায়ে ইসলাম:

আমি প্রথম দিকেই উল্লেখ করেছি ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আর এটা এমন নিখুঁত একটি জীবন ব্যবস্থা। যা সকল স্তরের মানুষের জীবন পরিচালনায় সকল সমস্যায় সমাধান দিতে সক্ষম। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন, শিশু থেকে বৃদ্ধ, ধনী থেকে গরীব, রাজা থেকে প্রজা, কর্মকর্তা থেকে কর্মচারীরও সমাধান দানে ইসলাম খুবই সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থায় একিবারেই শূন্যের কোটায় রয়েছে। আর এই সকল অক্ষম জীবন ব্যবস্থাগুলোই বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজের বিভিন্ন পেশার কর্মজীবী বিশেষ করে দিনমজুর শ্রমিকদের কষ্টের শেষ থাকে না। এই সকল শ্রমিকগণ ঠিকই তারা তাদের শ্রম দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মজুরী তারা ঠিক ভাবে পাচ্ছে না- যার ফলে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ পত্রের পাতায় তাদের

শ্রমের মজুরী আদায়ের আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া যায়। তা ছাড়াও তো গ্রামগঞ্জের শ্রমিকদের মজুরি আদায়ের জন্য ভোগান্তিতে পড়তেই হয়। যার কোন হিসাবই নেই। অথচ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে এর সুন্দরতম সমাধান।

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৪, হা: ২)

অনুরুপ ভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৪, হা: ৩)

এর পরেও যারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর আদেশকে অমান্য করে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার পরে শ্রমিককে তার মজুরি দিতে গড়িমসি করবে তাদের ব্যাপারে হাশরের মাঠে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব, আর যার প্রতিপক্ষ হব তা হবার মতই হবো। তারা হলো-

১. ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করে।

২. ঐ ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে।

৩. ঐ ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটিয়ে তার থেকে কাজ পুরাপুরী আদায় করল অথচ তাকে তার পারিশ্রমিক দিল না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৪, হা: ১)

✍ সমাজে মানুষের কিছু বদ অভ্যাস যা গোনাহের কারণ:

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমাজের মানুষদের বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের অধিকাংশ সাধারন মানুষগুলো যে কোন ছোট খাটো বিষয় নিয়েই একজন অপরজনকে গালি গালাজ করে থাকে। এমন কথা বলে গালি দেয় যা সে নয়। যেমন কেউ কাউকে জারজ সন্তান বলে গালি দিলো অথচ সেই ব্যক্তি জারজ সন্তান নয়। কেই কাউকে শালা বলে গালি দিলো অথচ সেই ব্যক্তি তার শালা নয়। কেউ কাউকে পতিতালয়ের নারী বলে গালি দিলো অথচ সে পতিতালয়ের নারী নয়। তবে অবশ্যই এই সকল গালি গুলোতে গালি দাতার ২ প্রকারের গোনাহ হবে।

১. এমনতেই কাউকে গালি দেয়া গোনাহের কাজ অথচ সে গালি দিয়েছে।
২. সেই ব্যক্তি যা নয়, তা বলে গালিদাতা তাকে গালি দিয়েছে।

আর এই সকল গালি অবশ্যই অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। যদি এই মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কারনে দুনিয়াতে গালিদাতার উপর শরিয়াতের বিধান কার্যকর না হয় তবে বিচার দিবসে তা কার্যকর হবে।

হযরত আমর ইবনু আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার তার এক ফুফুর সাথে দেখা করতে যান। সে তাকে খানা খাওয়ানোর জন্য দাসীকে ডাকে কিন্তু সে আসতে বিলম্ব করে। তখন সে বলে, হে ব্যভিচারিনী! তুমি তাড়াতাড়ি করনি কেন? তখন আমর (রাঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ, আপনি একটি মারাত্মক কথা বলেছেন। আপনি কি তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছেন। সে বলল, আল্লাহর শপথ, না। তখন তিনি (আমর) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন নারী কিংবা পুরুষ বা কোন কন্যাকে 'হে ব্যাভিচারিনী' বলে ডাকল অথচ সে তাকে ব্যভিচার করতে দেখেনি। কিয়ামতের দিন সেই কন্যা তাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করবে। কেননা, দুনিয়াতে তাদের প্রতি শরিয়াতের বিধান কার্যকর হয় না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩৪-৫৩৫, হা: ৩১)

অতএব কাউকে গালি দেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেহ আবার একথা বলতে পারেন অহেতুক একজন আমাকে গালি দিলো আর আমি তার গালির জবাবে গালি দিতে সক্ষম থাকলেও কি গালি দেব না? অথচ কোন অপরাধ ছাড়া আমাকে গালি দেওয়া হয়েছে? এমন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর অনেক আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ দিয়েছেন। হযরত ইয়ায ইবনু জুমান (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী ﷺ এমন কোন ব্যক্তি যদি আমাকে গালি দেয় এবং প্রতিশোধ হিসেবে আমিও যদি গালি দেই তবে তাতে কি পাপ হবে? তিনি বলেন, তারা উভয়েই শয়তান, মন্দলোক, মিথ্যাবাদী। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫২৬, হা: ৫)

আবার অনেক সময় দেখা যায় মানুষ যে, শুধু একে অপরকে গালি দিচ্ছে তা নয়, বরং পশু-পাখিকেও গালি-গালাজ করে। গ্রাম-গঞ্জে তো গরু, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগী এদেরকেও গালি-গালাজ দেওয়ার লোকের অভাব নেই। যা খুব সাধারণ ভাবেই করে যাচ্ছে। অথচ তা অত্যন্ত গুনাহের কাজ। আবার কখনো দেখা যায় ফজরের সময় মোরগ ডাকা-ডাকি করে, তখন অনেক মানুষ তাদের ঘুম ভাঙ্গার কারনে বিরক্ত হয়ে মোরগকে গালি দেয়।

হযরত যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন তোমরা মোরগকে গালি দিওনা, কেননা তা তোমাদের ছলাত আদায়ের জন্য জাগিয়ে দেয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩১, হা: ২১) আবার অনেক মানুষই আছে যারা সময়কে গালি দেয়, দিন ছোট হলে গালি দেয়, আবার দিন বড় হলেও গাল দেয়- এটাও মানুষের একটি বদ অভ্যাস। এটা অত্যান্ত গুনাহের কাজ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, বনি আদম সময়কে গালি দেয় অথচ আমিই সময়ের স্রষ্টা।

কেননা, আমার হাতেই রাত ও দিন (নিয়ন্ত্রিত)। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩৫, হা: ১)

মানুষের কিছু বদ অভ্যাসের মধ্যে এটিও একটি বদঅভ্যাস যে, মানুষ যাকে তাকেই যে কোন কারন-অকারনেই অভিশাপ করে থাকে। যা একটি বড় গোনাহের অর্ন্তভুক্ত। হযরত সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমরা যখন কাউকে দেখতে পাই যে, সে তার (মুসলিম) ভাইকে অভিশাপ দিচ্ছে, তখন আমরা মনে করি, সে একটি কবীরা গুনাহ করছে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩০, হা: ১৫)

আবার অনেক মানুষ দেখা যায় যারা রোদ্র-বৃষ্টি, ঝড়-বাতাসকেও অভিশাপ দেয়। অথচ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থেকে বাতাসকে অভিশাপ দেয়। তখন তিনি বলেন, তুমি বাতাসকে অভিশাপ দিওনা। কেননা, তা আদেশ পালনে রতো। যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয়, অথচ তা অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য নয়। তখন সে অভিশাপ অভিশাপদাতার উপরে বর্তায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩৩, হা: ২৬)

অন্য এক হাদিছে আছে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন- কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন অভিশাপ আসমানের দিকে উঠে যায়। তখন আসমানের দরজা বন্ধ করে দেওযা হয় পুনরায় তা জমিনে ফিরে আসে, কিন্তু পৃথিবীর দরজাও তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ডানে-বামে দৌড়াতে থাকে। যদি তা কোথাও প্রবেশের স্থান না পায় তখন তা অভিশাপকৃতের প্রতি ফিরে আসে, যদি তা তার উপযোগী হয়। অন্যথায় তা অভিশাপকারীর দিকে ফিরে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩০, হা: ১৬; আবু দাউদ)

অন্য এক হাদিসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যার প্রতি অভিশাপ করার, তার প্রতি যদি অভিশাপ করা হয়, যদি তা তার উপর পতিত হওয়ার হয় অথবা তিনি বলেছেন, যদি তা তাকে পাবার পথ পায়, তবে তাই হয়ে থাকে। নতুবা তা (অভিশাপ) বলে, হে আমার রব; আমাকে অমুকের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে অথচ আমি তাকে ধরার কোন পথ পাইনি এবং তার উপরে পতিত হওয়ার কোর সুযোগ পাইনি, তখন তাকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৩০, হা: ১৭)

✍ সমাজের মানুষদের ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা:

দেখা যায় ইসলামের ইবাদাত নিয়ে রয়েছে অনেকেরই ভুল ধারনা যা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করতে চাইলে আলোচনা ক্রমান্বয়েই বেড়ে যাবে। এই সকল ধারনা গুলোর মধ্যে একটি হলো চাকচিক্য বা সুসজ্জিত মসজিদ নির্মাণ নিয়ে। বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজে অনেকেরই ধারনা হলো ইবাদতের জন্য মাসজিদকে চাকচিক্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই চিন্তা ধারাটি যে, শুধু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেই রয়েছে তা নয়; বরং অনেক আলেমদের মধ্যেও রয়েছ। যার ফলেই বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজে ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে সুসজ্জিত মসজিদ নির্মানের প্রতিযোগিতা। এক মহল্লাবাসী আরেক মহল্লাবাসীকে টপকিয়ে আরো চাকচিক্য করে তৈরি করে তাদের মসজিদ। একদল আরেক দলকে টপকিয়ে একে অপরের চেয়ে অধিক চাকচিক্য মসজিদ নির্মান করছে যার কুফল আমি 'মসজিদে যিরার' আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আর এই সকল মাসজিদ নির্মানের পেছনে অর্থ দানের প্রতিযোগিতাও করে যাচ্ছে সমাজের অর্থশালী অনেকেই । শুধু যে মসজিদ নির্মানের জন্যই এ সকল দাতাগণ অর্থ দান করে যাচ্ছে তা নয়। বরং মাসজিদকে প্রাসাদ রূপ দান করতে টাইলস, এসি এবং অনর্থক ঝাড়বাতি লাগানোর জন্যও অর্থ দানের প্রতিযোগিতা করছে তারা। যদিও মাসজিদকে সুন্দর করা হারাম নয়। তবে মসজিদকে প্রাসাদ রূপদান

করতে অনর্থক টাকা খরচ করাও বোধ্য নয়। তা অবশ্যই অপচয়। আর অপচয় করা নি:সন্দেহে হারাম।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖؗ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

অর্থঃ আর তোমরা অপচয় করবে না নিশ্চই তিনি অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা আন-আম, আয়াত: ১৪১)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾

অর্থ: যাহারা অপচয় করে তাহারা তো শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৭)

এখন আপনি ভেবে দেখুন, আপনি সেই অর্থ কোন কাজে ব্যয় করেছেন, সেখানে আপনার প্রতিবেশি আত্মীয়-স্বজন এখনোও অভাব অনটনে খেয়ে না খেয়ে দিনাদিপাত করছে। এখনো অসংখ্য মানুষ আপনার পাশের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কাতরাচ্ছে, যখন আপনার অভাবী ব্যক্তি টাকার অভাবে ঔষধ ক্রয় করতে পারছে না ভালো চিকিৎসা নিতে পারছে না। আর আপনি মসজিদে টাইলস করার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছেন। আর সেই সময়ে আপনার পাশে থাকা আলেমটি আপনাকে মাসজিদে ঝাড়বাতি লাগানোর ফজিলাত শুনাচ্ছে ঠিক আপনার ঐ অর্থের প্রতি, সেই অর্থ ঋণগ্রস্তকে ঋণ থেকে মুক্তি দেয়ার কাজে ব্যয় হয়না, অথচ অনার্থক কাজে ব্যয় হয়। ঠিক সে অর্থকে, যেই অর্থ অভাবীদের খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্যয় হয় না। অথচ অনর্থক কাজে ব্যয় হয়। ঠিক আপনার পাশে থাকা সেই আলেমের মনগড়া ফতুয়ার প্রতি যেই ফতুয়া ইসলামের কোন

কাজে লাগবে না। অসহায়, অনাথের কোন কাজে লাগে না। শুধু নিজের স্বার্থে অনর্থক কাজে সেই ফতুয়া দেয়া হয়।

হে অর্থ দানকারী ভাই! আপনার মনে কষ্ট নিবেননা। আপনি আপনার দানকে যথার্থ কাজে লাগান। আপনার অর্থ সম্পদ যেন অনার্থক কাজে ব্যয় না হয়, সেই দিকে এখন দৃষ্টি রাখুন। নি:সন্দেহে মসজিদ নির্মাণ করা অনেক নেকির কাজ। কিন্তু মসজিদ রাজপ্রাসাদ বানাতেই হবে এমন কোন শর্ত আপনার প্রতি ইসলাম দেন নাই।

বর্তমান সমাজে এমন মানুষেরও অনেক দেখা যায় যারা ভাবে যেই মহল্লাতে মসজিদ সাধারন এই মহল্লার মানুষ আল্লাহ ভীরু নয়। সেই এলাকায় মানুষ গোনাহের মধ্যে রয়েছে, ক্ষতির মধ্যে রয়েছে আর যেই মহল্লার মসজিদ রাজ প্রসাদের মত চাকচিক্য, তারা ভাবে সেই সকল মহল্লাবাসী আল্লাহ ভীরু, নেককার। এই হচ্ছে তাদের মুত্তাকি মাপা চাবি কাঠি। অথচ ইসলামের হিসাব সম্পূর্ণটাই ভিন্ন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, অচিরেই তোমরা মসজিদ গুলোকে ইহুদি, খিষ্টানদের মতো কারুকার্য বা চাকচিক্য প্রসাদে গড়ে তুলবে। (আবু দাউদ, হা: ৪৪৮)

ইমাম বাগাভী (রহিঃ) বলেছেন, প্রথম দিকে ইহুদি-খিষ্টানদের ইবাদাতখানা গুলো কারুকার্য বা চাকচিক্যের প্রাসাদ ছিলো না। তারা আসমানী কিতাব বিকৃত করার পরই তাদের ইবাদাত খানা গুলো কারুকার্যময় করতে শুরু করে।

ইমাম খাত্তাবী (রাঃ) বলেন, ইহুদি-খিষ্টানরা যখন আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলে, আল্লাহর দ্বিনকে বিনষ্ট করে ফেলে, তখনই তারা গির্জা সুসজ্জিত করনের প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করে। (উমদাতুল ক্বারী-৭/৪১)

উপরোক্ত হাদিস ও ইমামগণের উক্তি থেকে এটাই স্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, মসজিদকে সুসজ্জিত বা চাকচিক্য করার সিদ্ধান্ত মানুষের মধ্যে তখনই হয় যখন,

তারা আসমানী কিতাবের প্রতি আমল থেকে দুরে সরে যায় এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছে। আর মসজিদকে সুসজ্জিত চাকচিক্য করা যে, একমাত্র সেই জাতির ধ্বংসেরই লক্ষণ তা'আরো স্পষ্ট হবে নিম্নের হাদিস থেকে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা মসজিদগুলোকে কারুকার্যময় চাকচিক্য করবে, কুরআনের কপিসমূহকে কারুকার্য মন্ডিত করবে, তখন তোমাদের ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না। (ইবনে আবু দাউদ, তাহকিকে আলবানী, ৫৮৫)

হে পাঠক! উক্ত হাদিসকে ডিগ্রীর শক্তি দিয়ে জোর খাটিয়েও যয়িফ বলার সুযোগ নেই। কেননা, হাদিসটি থেকে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে তা ভবিষ্যৎবানীর হাদিস, আর ততকালিন সময়ে মসজিদ, বর্তমান সময়ের মতো সুসজ্জিত প্রাসাদ ছিলো না এবং কুরআনের কপি সমূহ বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন পদ্ধতির সংকলনকৃত কুরআনের কপিগুলোর মতো কারুকার্য মন্ডিত ছিলো না। যেমন-কুরআন মাজিদ এর মধ্যে বিভিন্ন রং বেরং এর চিহ্ন, কলম চিহ্ন, ছাতা চিহ্ন, কলস চিহ্ন, গোলাপ চিহ্ন ইত্যাদি। অতএব সেই ভবিষ্যৎদ্বানির হাদিসটি বর্তমানে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর হাদিস ছহিহ ব্যতীত কখনও সত্য বলে প্রমানিত হবে না। কাজেই বর্তমানে প্রতিযোগিতা মূলক নির্মানকৃত সুসজ্জিত চাকচিক্য প্রত্যেকটি মসজিদই ধ্বংসের লক্ষণ। তবে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে পবিত্র স্থানের নিদর্শনকৃত মসজিদগুলো ভিন্ন।

আর মসজিদ কারুকার্যময় করার কয়েকটি রুপ উল্লেখ করে ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী সাহেব বলেন,

১. দেয়ালে বাহারি রং ও বর্ণের আল্পনা আঁকা।
২. মনো মুগ্ধকর দৃশ্যের ছবি।
৩. কারুকার্যময় বা নকশিদার জায়নামাজ ও কার্পেট বিছানো।
৪. চাকচিক্যময় লাইট ও ঝাড়বাতি ঝুলানো।

এসব আল্পনা, কারুকার্য ও ঝাড়বাতির পেছনে এতো বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয় যে, আপনি হিসেব করলে দেখবেন এ অর্থ দিয়ে আরো ২/৩টি ছোট মসজিদ অনায়াসে তৈরি করা যাবে। আমার একথার অর্থ এটা নয় যে, মসজিদগুলোর প্রতি কোনো খেয়াল রাখা যাবে না বা মসজিদকে সুন্দর কার্পেট বিছানো যাবেনা কিংবা মসজিদকে দুর্বল ও বিশ্রী করে তৈরি করতে হবে। বরং হাদিসে সুন্দর করতে গিয়ে সীমাতিরিক্ত করে ফেলা কিংবা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠার বিরুদ্ধে সর্তক করা হয়েছে। (মহাপ্রলয়- পৃ: ১২২)

হে পাঠক! বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের কারুকার্যময়, চাকচিক্য, সুসজ্জিত প্রসাদ রুপী সকল মসজিদগুলোর অতিরঞ্জিত এবং সীমাতিরিক্ত কেননা, বাংলাদেশে সেই সকল মসজিদ তৈরির উপযুক্ত নয়। এদেশের অধিকাংশ মানুষই ঋণগ্রস্ত, অভাবী, আনাহারী। সমাজের মানুষের ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারনার মধ্যে এটিও একটি যে, আল্লাহ যাকে ভালো বাসে তাকে দুনিয়াতে অর্থ সম্পদ দান করেন আর যাকে অপছন্দ করেন তাকে অভাব অনটনের মধ্যে রাখেন। যার বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করছি আমি পাবনা, সাঁথিয়া উপজেলার এক মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ঐ মসজিদের এক বৃদ্ধ মুসল্লি সম্পর্কে আমি তাকে নানা ডাকতাম তিনি একদিন আমাকে এসে বলেন, আমি পীর ধরেছি। পীর ধরা ফরজ, আর আমার পীর একজন আল্লাহর ওয়ালী। আল্লাহ তাকে অনেক ভালোবাসেন। আমি আর পীর ধরা ফরজ কথটি নিয়ে বেশি বিতর্ক না করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ভাবে বুঝলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনার পীর সাহেবকে অনেক ভালোবাসেন? সে আমাকে উত্তর দিলো, আমার ঐ পীর সাহেব এর কাজে তার মুরিদানদের মধ্যে আমরাই কয়েকজন প্রথম। আর আমরা যখন মুরিদ হয়েছিলাম তখন আমার পীর সাহেবের বাড়ি টিনের ছাপরার সাধারন একটি ঘর নদীর পাশে, আর এখন আল্লাহর রহমতে আমার পীর সাহেবের মুরিদও দিনে দিনে অনেক বেড়েছে আর বাড়ি হয়েছে তিন তলা বিল্ডিং, টাইলস করা, এটাষ্ট বাথরুম এবং এসি লাগানো। যদি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমার পীর

সাহেব অধিক পছন্দের না হতো তবে এতো তাড়াতাড়ি এতো অর্থ সম্পদ হতো না। আল্লাহ তাকে পছন্দ না করলে অভাব অনটনেই তাকে দিন কাটাতে হতো।

এরূপ আরো একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি- একদিন আছর এর ছলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আমি আমার নিজ গ্রামের মাসজিদে যাই, মাসজিদটি আমার ঘরের সাথেই প্রায়। সেই দিন আছর ছলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আমি মাসজিদে আছি। এমন সময় আমার পাশে বসে থাকা ব্যক্তি যিনি আমাদের মহল্লারই একজন মাতব্বর, প্রামানিক এবং সমাজের বিত্তশালী একজন ব্যক্তি, প্রতিবেশি সম্পর্কে তিনি আমার দাদা হন। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেন, তুই তো অনেক ছোট থেকেই আল্লাহর পথে আছিস, আল্লাহ তা'য়ালা তাহলে তো তোকেও আল্লাহর পছন্দ হবার কথা। তোকে আল্লাহ পছন্দ করে না কেন? তোকে পছন্দ করলে কী আল্লাহ তোকে অর্থ সম্পদ দিতো না? অথচ তোর মতো হুজুর এই গ্রামে আরো অনেক আছে। যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, জমি ক্রয় করছে- বিল্ডিং বাড়ি দিচ্ছে আর অনেক টাকা পয়সাও জমা করছে। তারা তো এতো ধর্ম ভীরূ হয়ে চলে না তাও আল্লাহ তাদেরকে তোর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

হে পাঠক! কথাটা সেই দিন তিনি আমাকে উপহাস করে বলে মসজিদে উপস্থিত সকল মুসল্লীদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল তা আমি জানি। সেই উপহাসে সেই দিন আমার মনটা একটু কষ্ট অনুভব ও লজ্জাবোধ করলেও পরোক্ষনে যেন মনটা এক প্রশান্তি অনুভব করলো একথা ভেবে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ যিনি এই দুনিয়াতে চাটাই এর বিছানায় শুয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন, অনাহারে দিন কাটিয়েছেন অথচ তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অধিক পছন্দের। যার প্রসঙ্গে নিম্নে একটি হাদিস উল্লেখ করলাম হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একবার আল্লাহর রসূল ﷺ জহুলে শোয়ার করনে তার শরিরে চাটাইয়ের দাগ বসে যায়। এমনটি দেখে বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ; আপনার জন্যে নরম কিছুর ব্যবস্থা করতে আপনি আমাদের অনুমতি দেন না কেন? ফলে রসূল ﷺ বললেন, আমার ও দুনিয়ার মাঝে কি সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো এক আরহী

ও এক গাছের মতো, যে গ্রীষ্মকালে কোন এক গাছের ছায়ায় একটু আরাম করে, অত:পর গাছটি ছেড়ে চলে যায়। (আয যুহুদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্মলী রহি:-৫৭)

অতএব দুনিয়াতে অর্থ সম্পদ থাকায় প্রমানিত হয় না যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন আর যার অর্থ সম্পদ নেই, আল্লাহ তাকে প্রত্যাখান করেছেন। সুতরাং এ সকল ধারনা করা অজ্ঞতার কারণ এবং অতি গোনাহের কাজ। উপরোক্ত বাস্তব ঘটনাটি সমাজে চলতে গিয়ে আমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা যা আমি নিজ কর্নে এমন মন্তব্য করতে শুনেছি। কাজেই সমাজের এই ভ্রান্ত ধারনাটি তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করলাম যেন এ থেকে মুসলিমগণ সতর্ক হন এমন ধারনা থেকে।

এরুপ ভ্রান্ত ধারনা কারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

অর্থ: মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অত:পর সম্মান অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন অত:পর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (সূরা ফাজর, আয়াত: ১৫-১৬)

উপরে উল্লেখিত আয়াতের আলোচনায় তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআনে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহি:) "দুনিয়াতে অধিক অর্থ সম্পদ হওয়া ও স্বল্প অর্থ সম্পদ হওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র অথবা প্রত্যাখান হওয়ার আলামাত নয়" নামে একটি শিরনামই উল্লেখ করেছেন যার বিস্তারিত আমি নিম্নে উল্লেখ করলাম- মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহি:) বলেন, "ফাআম্মাল ইংছানু" আয়াতে

আসলে কাফের ইনছান বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যপক অর্থে সে সব মুসলমান এর অর্ন্তভুক্ত যারা নিম্নরুপ ধারনায় লিপ্ত থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা যখন কাউকে জীবনে সমৃদ্ধি, স্বাছন্দ, ধন-সম্পদ ও সুস্থতা দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারনায় লিপ্ত করে দেয়।

১. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টায় অবশ্যকীয় পাওয়া ফল, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র।

২. আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি প্রিয় পাত্র না হতাম তবে তিনি আমাকে এ সকল নেয়ামাত দান করতেন না।

এমনি ভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখিন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রিয় পাত্র না হওয়ার দলিল মনে করে। কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারনা ছিলো এবং কুরআন মাজিদ এ কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল মুসলমানও এই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য আয়াত সমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন। ''কাল্লা'' অর্থাৎ তোমাদের এ ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে খোদায়ী দাবি করা সত্বেও ফেরাউনের কোন দিন মাথা ব্যাথ্যাও হয়নি, অপর পক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে ছিরে দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মুহাজিরগনের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নি:স্ব ছিলো তারা ধনী মুহাজিরগনের অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে। (তাফসিরে মাযহারী) অন্য এক হাদিসে আছে আল্লাহ তা'য়ালা যে বান্দাকে ভালো বাসেন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ। (তাফসিরে মাযহারী)

অন্য এক হাদিসে মাহমুদ ইবনু লাবিদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় মু'মিন বান্দাকে দুনিয়ার কাছ থেকে এমন ভাবে রক্ষা

করেন যেমন তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিকর জানো এমন সব খাবার পানীয় থেকে রক্ষা করো বা বিরত রাখো। (মুসনাদে আহমদ, হা: ৪২৮৫; তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ১৪৫৫)

অতএব কারো অর্থ সম্পদ না থাকলেই তাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন এমন ধারনা করা অবশ্যই গোনাহের কাজ এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সকল অভাগী দরিদ্রদেরকেই অধিক ভালোবাসেন।

হযরত উসামা (রাঃ) বলেন, নাবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাড়িয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। আর ধনবান ব্যক্তিরা (তাদের ধনের হিসাব দেয়ার জন্য) তখনও আটকে আছে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬৫৪৯; মুসলিম, হা: ২৭৩৬)

অপর এক হাদিসে মুস'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুর ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর লোকদের কারণেই বিজয় ও রুজি লাভ করে থাকো। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৮৯)

অনুরুপ ভাবে সমাজে আরেক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় বরং এই শ্রেণীর মানুষগুলোই বেশি তারা ইসলামের বা নিজেরই খুবই প্রয়োজনীয় কোন কারণ ছাড়াও বড় বড় বিল্ডিং বাড়ি তৈরিতে মনোযোগী হয়। এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে শুধু যে সাধারণ মানুষ তা নয় বরং এই সকল কাজে অনেক আলেম ওলামাও খুব কঠিন ভাবে ঝুকে পড়েছে। অথচ এমন বড় বড় বিল্ডিং তার এবং ইসলামের কোনই প্রয়োজন নেই। যদিও তর্কের খাতিরে প্রয়োজন দেখাবে-তবুও তাতে মানুষকে ধোকা দেওয়া গেলেও মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ধোকা দেওয়া যাবে না। কেননা, মানুষের প্রয়োজন সাধারন বসবাসের উপযোগী ঘর-বাড়ি। তা ছাড়া জরুরী প্রয়োজন ব্যতিত শুধু বিলাসিতা, লোক দেখানোর জন্য ঘর বাড়ি তৈরি নিষেধ।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে বের হলাম। তিনি একটি সুউচ্চ বিল্ডিং দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? ছাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, এটি অমুক আনসারীর। তিনি নিরব রইলেন এবং মনে মনে রাগান্বিত হলেন, এমন কি বিল্ডিং এর মালিক এসে লোকদের মাঝে আল্লাহর রসূল ﷺ কে সালাম দিলো। তিনি সেই আনসারির থেকে বেশ কয়েকবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এমন কি আনসারি ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে সে সাহাবীগণকে কারণ জিজ্ঞেস করল। সে বলল আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে অসন্তুষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা বলল, তিনি বেরিয়ে তোমার বিল্ডিং দেখেন। সে মতে সে তার বিল্ডিং এ ফিরে গিয়ে তা গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। পরে আল্লাহর রসূল ﷺ সে পথে বের হন। কিন্তু বিল্ডিংটি আর দেখতে পাননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিল্ডিংটির কি হলো? তারা বলল বিল্ডিংটির মালিক আপনার অসন্তুষ্টির কথা আমাদের কাছে বলেছে। সে মতে, আমরা তাকে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) অবহিত করলাম। তাই সে বিল্ডিংটি ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি বললেন, সাবধান! প্রত্যেক ঘর-বাড়িতে রয়েছে মালিকের জন্য ভয়াবহ পরিনাম। তবে সে ঘর ব্যতিত যার দ্বারা গরম, ঠাণ্ডা ও হিংস্র জন্তুর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (আত তাগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০, হা: ৩)

অন্য এক হাদিসে হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বান্দার অনিষ্ট চাইলে তার কাছে ইট ও মাটি আকর্ষণীয় করেন, ফলে সে দালান-কোঠা গড়ে তোলে। (আত তাগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩১, হা: ৫)

হযরত আবু বাশীর আনসারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা কোন বান্দার অকল্যণ চাইলেই কেবল সে তার অর্থ-সম্পদ দালান-কোঠা তৈরীর কাজে ব্যয় করে। (আত তাগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩১, হা: ৬)

উপরোক্ত হাদিসগুলোতে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিয়মান হয় যে, কোন কারণ ব্যতিত বসতবাড়ির জন্য এ সকল বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করা নিন্দনীয় এবং গোনাহের কাজ। হয়তো অনেকেই ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞাকে ঢাকতে বিতর্কের মাধ্যমে নিজেদের বসতের জন্য বড় বড় বিল্ডিং বাড়ির প্রয়োজনীয়তা দেখাতে পারবেন মানুষের কাছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা কাছে নয়। আপনার পরিবারের ৫/১০ জন সদস্য এর জন্য কততলা বিল্ডিং আপনার প্রয়োজন? আপনি আপনার চেয়ে নিম্নমানের ৫/১০ জন সদস্যের একটি পরিবারের দিকে তাকালেই দেখতে পারবেন আর আপনার উত্তর সেখানেই রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অবস্থার দিকে তাকাও উচু শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। (মুসলিম, হা: ২৯৬০)

সমাজে অনেক গুণী লোকই আছে যারা এমন বড় বড় বিল্ডিং বানাতে পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে ঘরে বিলাসিতা প্রিয় স্ত্রী থাকলে সেই স্ত্রীর কথা রাখতে এবং তার প্রতিনিয়ত চাপে দুই তলা/পাঁচ তলা বিল্ডিং বানাতে বাধ্য হয়। এ সকল গুনি লোকদের অবস্থা এমন যে, তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর কথা অমান্য করে স্ত্রীকে প্রধান্য দেয় এবং স্ত্রীর সন্তুষ্ট অর্জনের পেছনেই পড়ে থাকে। মনে রাখবেন, আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাঁচ তলা বাড়ি নয়। একটি রুম থাকলেও আপনার ঐ রুম দ্বারা আপনি গোনাহ জমা করতে থাকবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর আপনার ঐ বাড়ি দ্বারা ইসলামের বিন্দু পরিমাণও কোন উপকার হবে না। আপনার একটি বাড়ি আছেই সেখানে আপনি আপনার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে খুব ভালো ভাবেই দিন অতিবাহিত করছেন। অথচ আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কথা শুনে স্ত্রীর চাপে রাজ প্রাসাদের ন্যায় আবার দুই তলা/পাঁচ তলা বিল্ডিং দিচ্ছেন। অথচ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন কাজ আপনার এই বিল্ডিং দ্বারা হচ্ছে না। তবে মনে রাখবেন আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বিল্ডিংই যথেষ্ঠ। আপনি হাদিসের নিষেধাজ্ঞা দেখে ভয় পাননা আবার

খুজে বেড়ান বিল্ডিং এর পক্ষে কোন দলিল আছে কি না? অবশ্যই এটা আপনার গোড়ামী, আপনি অপেক্ষা করুন। কত বছর ঐ বিল্ডিং-এ থাকবেন ৬০ বছর? ১০০ বছর? তারপর আপনার পথযাত্রা কোথায় একটি বার ভেবে দেখুন। তবে হ্যাঁ যদি আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনে বাড়ি তৈরি করেন তবে তাতে গোনাহ নেই বরং এটাও আপনার জন্য ছদাকা। তবুও সাধারণ ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই নিম্নের হাদিসটি মনে রাখতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে দালান কোঠা বানায়, কিয়ামতের দিন তাকে পাপের বোঝা বহনে বাধ্য করা হবে। (আত তাগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩১, হা: ৭)

অতএব, এখন আপনাকে জানতে হবে কোন প্রয়োজনের কারনে আপনি কত বড় বা কত তলা বাড়ি তৈরি করতে পারবেন? এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, সৌভাগ্যের বস্তু তিনটি, তা হলো-

১. সতী স্ত্রী, যে তোমাকে আনন্দ দেবে এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার ও নিজের সম্পদের সংরক্ষণ করবে।
২. অনুগত দ্রুতগামী বাহন, তা তোমাকে সহযোদ্ধার কাছে (অল্প সময়ে) পৌছে দেবে।
৩. এবং প্রশস্ত বাস ভবন, যাতে অনেক সহযোদ্ধাদের স্থান হবে।

তিনটি দুর্ভাগ্যের বস্তু হলো-

১. এমন স্ত্রী, যে তোমাকে কষ্ট দেয় এবং তোমার সাথে বাক-বিতর্ক করে, আর যদি তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকো তাহলে সে তার নিজের এবং তোমার সম্পদের নিরাপত্তা দেয় না।

২. এমন উচ্ছৃংখল প্রাণী (বাহন) যদি তুমি আঘাত কর, তবে তা তোমাকে আক্রমন করে, আর যদি তুমি ছেড়ে দাও তবে তুমি তোমার সহযোদ্ধাদের কাছে পৌছাতে পারবেনা।

৩. এমন অপ্রশস্ত বাড়ি, যাতে কেবল অল্প কয়েকজন সহযোদ্ধাদের থাকার স্থান হয়। (আত তাগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৮, হা: ১০)

এখন আপনি ভেবে দেখুন এতো টাকা খরচ করে আপনি যেই শখের বাড়িটি করেছেন তা কাদের জন্য করেছেন। আপনার শখের সেই বিশাল বাড়িটি করা উচিৎ ছিলো আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য এবং আপনার দ্বীনি ভাইদের জায়গা করার জন্য। কিন্তু আপনি করেছেন আপনার আত্মীয়-স্বজন অথবা আপনার স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য এবং যখন আপনার বাড়ি আপনার দ্বীনি ভাইয়েরা দ্বীনি আলোচনার জন্য বসতে চায় তখন তাদের জন্য আপনার বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আপনার বাড়িতে বসে থাকা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা মুজাহিদদের তাড়িয়ে দেন। আপনার বাড়িতে মুজাহিদদের জায়গা দিতে ভয় করেন, সংকোচ বোধ করেন। কি হবে আপনার এই লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাসাদ দিয়ে? যে প্রাসাদ দিয়ে দ্বীন ইসলামের মহৎ কোন কাজে না আসে? আল্লাহকে ভয় করুন! আল্লাহকে ভয় করুন! ভুলে যাবেন না আপনাকে একদিন দন্ডায়মান হতে হবে সেই মহান পালনকর্তার কাছে। আজকে যাকে আপনি দুরে ভাবছেন, আপনি ভুলে যাবেন না, আপনার ভেতরে থাকা রূহটা যেদিন চলে যাবে, যেদিন আপনার দেহ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রবে। সেই দিন আপনার ঐ বিশাল বাড়িটিতেও আপনার জায়গা হবে না। সেই দিন আপনার ঘর তৈরির জায়গা খোজা হবে আপনার সেই শখের বাড়ি থেকে দুরে। আপনাকে যেই ঘরে শোয়ানো হবে সেই ঘরে কোন খাঁট থাকবে না শুধু মাটির শক্ত বিছানা থাকবে। আপনার ঘরে ছাদের রডগুলো হবে কাঁচা বাঁশের আর আপনার ঘরের ছাদ ঢালাই হবে একটি পলিথিন আর মাটি দিয়ে।

কেন প্রাসাদ তৈরি করছেন আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে যেই প্রাসাদে আপনারই জায়গা হবে না? কোন প্রাসাদের বড়াই করছেন আপনি যেই প্রাসাদে আপনাকেই রাখা হবে না? আফসোস! আপনার জন্য আপনি যদি সেই বিল্ডিংটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতেন, আপনার মুজাহিদ ভাইদের তা'লিমের জন্য করতেন তবে আপনার একাকিত্বের সময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে এর চেয়েও একটি উত্তম প্রাসাদ উপহার দিতেন। আপনার বাড়িতে আপনার সেই দ্বীনি ভাইদের তা'লিমের ভিডিও দেখে আপনি হাশরের মাঠে আনন্দিত হতেন কিন্তু আজকে যখন আপনার প্রাসাদ আপনার মুজাহিদ ভাইদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন আপনার প্রাসাদের স্থান আপনার মুজাহিদ ভাইদের জন্য সংকির্ণ করে দিয়েছেন। আপনার বাড়ি থেকে আপনার মুজাহিদ ভাইদের বের করে দেওয়ার কৌশল করেছেন। আপনার এই ভিডিও গুলোও হাশরের মাঠে আপনাকে দেখানো হবে। তা দেখে আপনি লজ্জিত হবেন, বড়ই লজ্জিত হবেন আপনি। যদি সত্যিই এমন করে থাকেন তবে এখনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট খাটি তাওবা করুন, আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ اَنِیْبُوْۤا اِلٰی رَبِّکُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾

অর্থ: ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের দিকে এবং অনুগত হও, তোমাদের উপর আযাব আসার আগে। (সূরা যুমার, আয়াত: ৫৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰی رَبُّکُمْ اَنْ یُّکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّاٰتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ یَوْمَ لَا یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ یَسْعٰی بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ بِاَیْمَانِهِمْ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۸﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।’ (সূরা তাহরীম, আয়াত: ৮)

অন্যথায় মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ

اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا

عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নুর, আয়াত: ৩১)

✍ সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শিক্ষা:

অন্যায় ও অন্ধকার আচ্ছাদিত সমাজকে বদলে নতুন সমাজ গঠন একটি অপরিহার্য্য বিষয়। আর অসুন্দর সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শিক্ষা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে নিখুঁত ভাবে। সমাজকে উন্নয়ন বা সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইলে ব্যক্তি চরিত্রের উন্নয়ন অপরিহার্য্য। কেননা যখন কোন সমাজে একজন চরিত্রবান ব্যক্তি থাকবে তখন সেই ব্যক্তির দ্বারা অনেক অনৈতিক কাজ থেকেই সমাজ মুক্ত থাকবে। যা একটি আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কাজেই সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শিক্ষার প্রথম স্তরই হলো ব্যক্তি চরিত্রের উন্নয়ন। নিম্নে সুন্দর চরিত্রের গুরুত্বের হাদিস তুলে ধরলাম।

✍ সুন্দর চরিত্রের গুরুত্ব:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ ও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। (ছহীহ বুখারী ৬৩৫)

অন্য এক হাদিসে হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিবসে মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়ি পাল্লায়) সুন্দর চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীল ভাষী মুখকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী, হা:২০০৩; ইবনু হিব্বান, ৫৬৬৪; আবু দাউদ, হা: ৪৭৯৯)

উক্ত হাদিসগুলোতে সুন্দর চরিত্র গঠনের মূল কেন্দ্র বুঝানো হয়েছে মুখকে। কেননা এই মুখ দ্বারা মানুষ মিথ্যা কথা, অশ্লীল ভাষায় গালি এবং সমাজের মানুষকে বিভিন্ন ভাবে মুখ দ্বারা কষ্ট দিতে পারে পক্ষান্তরে এই মুখ দ্বারা সত্য কথা, সুন্দর ভাষা এবং বিভিন্ন ভাবে মুখ দ্বারাও সমাজের মানুষরে উপকার করা সম্ভব। কাজেই ব্যক্তি চরিত্র গঠনের মূল উপাদান হলো মুখের হেফাজত করা। এক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের হেফাজতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যে ব্যক্তিকে তার দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গ (যৌনাঙ্গ) এর অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, হা: ১৯৬৪) আর চরিত্রকে সুন্দর করতে চাইলে লজ্জাশীলতার গুরুত্ব রয়েছে অপরিসীম।

✍ লজ্জাশীলতার গুরুত্ব:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়। (হাকেম; মিশকাত, হা: ৫০৯৪; ছহীহ জামে, হা: ১৬০৩; আমলে নাজাত, আব্দুল হামীদ ফায়যী, পৃ: ২৬৬, হা: ৩)

হযরত আনাছ (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মে সচরিত্রতা হলো লজ্জাশীলতা। (ইবনু মাজাহ; ছহিহুল জামে, হা: ২১৪৯; আমলে নাজাত, আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৬৬, হা: ৬)

অন্য এক হাদিসে আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহরন করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সুন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে। (তিরমিযী, হা: ১৬০৭; আমলে নাযাত, আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৬৬, হা: ৪)

উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে লজ্জা ও ঈমানের সম্পর্ক খুব সহজেই প্রতিয়মান হয়। মানুষের সমাজ জীবনের বর্তমানে যে দুরবস্থা, তা থেকে নিজের চরিত্রকে বেঁচে রাখার মূল উপাদান হলো লজ্জা। যেই ব্যক্তির লজ্জা নেই, সেই ব্যক্তি সমাজের সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ করতে পারে। মানুষের সাথে ঝগড়া-ফাসাদ, কারনে-অকারনে মানুষকে অশ্লীল ভাষায় গালা-গালি, চুরি-প্রতারনা, নেশা, যেনা; এক কথায় সমাজের সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, প্রথম নাবুওয়াতের বানী সমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বানী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে, যা মন চায় তাই কর। (আমলে নাযাত, আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৬৬, হা: ৫; মূসনাদে আহমাদ; ছহীহ বুখারী; আবু দাউদ; ইবনু মাজাহ; ছহিহুল জামে, হা: ২১৪৯)

অতএব মানুষের যখন লজ্জা থাকে না তখন সেই ব্যক্তি যা ইচ্ছা সমাজে তাই করে বেড়াতে পারে আর সমাজের মানুষও তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদিও কেহ কেহ তাকে দেখে সম্মান প্রদর্শন করে কিন্তু তা নিজের সম্মান হারানোর ভয়ে। কেননা লজ্জাহীন ব্যক্তিটি সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর ঐ লজ্জাহীন ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর প্রতিও কোন ভয় থাকে না, আস্তে আস্তে আল্লাহর প্রতি সকল ভয় তার উঠে যায়।

হযরত মুজাম্মি ইবনু হারিসা ইবনু যায়িদ ইবনু হারিসা (রাঃ) তিনি তার চাচার সূত্রে বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, লজ্জা ঈমানের অংশ, কাজেই যার লজ্জা নেই, তার ঈমানও নেই। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৫৮, হা: ১২)

অন্য এক হাদিসে হযরত ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, নাবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন বান্দার ধ্বংস চান, তখন তার লজ্জা দূর করে দেন। ফলে, আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ ছাড়া তার থেকে অন্য কোন কাজ পাওয়া যায় না। এরপর যখন সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে ডুবে থাকে, তখন তার (অন্তর) থেকে আমানত কেড়ে নেয়া হয়, আর যখন তার (অন্তর) থেকে আমানত কেড়ে নেয়া হয়, তখন সে পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। এরপর তার মধ্যে যখন বিশ্বাসঘাতকতাই পাওয়া যায়, তখন তার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়। আর যখন তার (অন্তর) থেকে দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন সে বিতাড়িত (শয়তানের) কাজে নিমগ্ন থাকে,

তখন তার ঘাড় থেকে ইসলামের রজ্জু ছিনিয়ে নেয়া হয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৬০, হা: ১৪)

অতএব ইসলামী সৌন্দর্যের মূলে লজ্জাশীলতাকেই দেখতে হবে। সমাজে অনেক সময় দেখা যায় যে, লজ্জাশীল ব্যক্তিদেরকে নিয়েই উপহাস করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি সমাজে অধিক লজ্জাশীল হয়, তবে তাকে নিয়ে সমাজে উপহাসমূলক কথার কোন অভাব থাকে না। উদাহরণ স্বরুপ একটি ছোট বাস্তব ঘটনা বলা যায়- আমি চক্ষু লজ্জায় মানুষের সামনে গোসল করতে পারিনা, যত গরমই পড়ুক না বডিতে একটি গেঞ্জি হলেও থাকবে। এমন অবস্থা দেখে আমার প্রতিবেশিদের অনেকেই আমার আড়ালে বিভিন্ন কথা বার্তা বলত, একদিন আমার গোসলের সময় শরীরে গেঞ্জি দেখে একজন হাসির ছলে বলেই ফেললো 'ছুড়াটা মেয়ে মানুষের মতো লজ্জাই কাটে না'। এমন ঘটনা সমাজে যে, শুধু একটাই এমন নয়, বরং এমন ঘটনা শত শত ঘটে থাকে। সমাজে যারা কোন লজ্জা-শরম না করেই উচ্চহাসি দিয়ে মানুষের সাথে চাটং চটাং কথা বলে, নাভির নিচে প্যান্ট পড়ে, শার্টের বোতাম খুলে রাখে বা বিভিন্ন হাস্যকর কথা বলে, কিংবা কোন মানুষকে দেখে লজ্জা শরমের কোন পরোয়া করে না, এমন ব্যক্তির সমাজে কোন অভাব নেই। এমন ব্যক্তিদেরকে স্মার্ট, হ্যান্ডসাম বিভিন্ন উপাধি দেওয়ার লোকের অভাব নেই। অথচ লজ্জাশীলতার দিক দিয়ে নারীদের মতোই হওয়া উচিৎ পুরুষদের। ইচ্ছে করে কোন পুরুষ খালি শরীরে বা অর্ধ উলঙ্গ না থাকা সর্ব উত্তম, কথা ও কাজেও লজ্জাশীলতা উত্তম। এই লজ্জাশীলতার প্রসঙ্গে হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ পর্দাশীল কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিকতর লজ্জাশীল ছিলেন। কোন বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হলে, তাঁর চেহারা দেখেই আমরা বুঝতে পারতাম। (রিয়াদুছ ছলেহীন, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৯, হা: ৬৮৫)

আবার সমাজে অনেককেই দেখা যায় সমাজে কেহ একটু বেশি লজ্জাশীল হলে তার এই এতো লজ্জাশীল হওয়া যাবে না বলে সমাজের অনেক জ্ঞানী-গুণী মহল

থেকেই আসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ। গ্রাম-গঞ্জে এই লজ্জা-শরম নিয়ে প্রবাদ বাক্যও রয়েছে অনেক। তার মধ্যে একটি হলো- শরম করলে গরম ভাত মিলবে না, শরমে বৌ বাচে না, ইত্যাদি। আবার অনেকেই বলে থাকে বেশি শরম ভালো না অথচ সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে লাজুক স্বভাবের জন্য তিরস্কার করছে, তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, মনে রেখো লজ্জা ঈমানের অংশ। (শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী (রহি:) পৃ: ৮০; আবু দাউদ, হা: ৪৭৯৭)

হযরত ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, লজ্জার সবটুকুই কল্যাণময়, লজ্জা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে। (আমলে নাজাত, আব্দুল হামিদ ফাইযী, পৃ: ২৬৬, হা: ৭; ছহীহ বুখারী; মুসলিম; ছহিহুল জামে, হা: ৩১৯৬, ৩২০২)

✍ সালাম প্রদান:

সালাম প্রদান পদ্ধতিটি সমাজকে অতি সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সমাজের একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক আরো দৃঢ় করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সালামের প্রচলন করবে। (মুসলিম, হা: ৫৪; রিয়াদুস সালেহিন, ২য় খন্ড, পৃ: ২১৮, হা: ৮৪৯)

উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালাম প্রচলনের মধ্যে দিয়ে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এমন কি সালাম ব্যাপক ভাবে প্রচলনের

ফলে শত্রুও বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সালাম ব্যাপক ভাবে প্রচলনের ফলে সমাজে এমন এক শ্রেণির জনশক্তি তৈরি হয় যারা আপনার পক্ষ থেকে না লড়লেও বিপক্ষে লড়বে না। তবে অবশ্যই সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজের প্রধান লোকদের বেছে বেছে সালাম দেয়া যাবে না। সালাম প্রদানের নিয়ম সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি চেনা অচেনা নির্বিশেষে সবাইকে খাবার খাওয়াবে এবং সালাম করবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬২৩৬; মুসলিম, হা: ৩৯; রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খন্ড, পৃ: ২১৭, হা: ৮৪৬)

সালাম প্রদানের নেকী লাভের ফজিলত সম্পর্কে হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম' তিনি তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে নাবী ﷺ বললেন, ১০টি নেকী এর জন্য। অতঃপর ২য় ব্যক্তি এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তিনি তার উত্তর দিলেন। অত:পর লোকটি বসলে, তিনি বললেন, ২০টি নেকি এর জন্য। অত:পর ৩য় জন এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ'। অত:পর লোকটি বসলে, তিনি বললেন, ৩০টি নেকী এর জন্য। (আমলে নাজাত আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৭৭, হা: ৪; তিরমিযী; আবু দাউদ, হা: ৪৩২৭; রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খন্ড, পৃ: ২১৯, হা: ৮৫২)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বর্তমান সমাজের অসভ্যতা দূরীকরণে সালাম প্রদানের ভূমিকা খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তবে সালাম এর পাশাপাশি আরো একটি অভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ তা হলো-

✍ পরস্পরের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত:

একজন অপরজনের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করা বা কথা বলা উত্তম একটি গুন। তবে এই গুনটি সমাজের অনেক মানুষেরই থাকে না। তাদের চেহারা সকল সময়ে এমন একটি অবস্থা হয়ে থাকে যেন মুখটি ঝড়ের মেঘ। সকল সময়ই কঠোর হয়ে থাকে, মানুষের সাথে কথা বলতে লাগলে অহংকারের সাথে কথা বলে, তার মুখের অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ তার সাথে কথা বলতে ভয় পায়। এমনটি হওয়া কখনোই উচিৎ নয়। আপনার মনে যতই কষ্ট থাকুক না কেন সর্বদায় চেষ্টা করতে হবে অপরের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলার।

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তা তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করেও হয়। (মুসলিম, হা: ২৬২৬)

অথচ সমাজে দেখা যায় তার ভিন্নটা- একজন আরেক জনের সাথে একটু কথার মিল না থাকলেই তার প্রতি মুখ ভার করে থাকে অনেকেই এমনটি যে শুধু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, অনেক ইসলামী দলগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। এরূপ যদি কোন দলের ব্যক্তি অপর কোন দল বা মতের ব্যক্তিকে দেখে তবে হঠাৎ করেই তার মুখটা কালো হয়ে যায়। এটা অবশ্যই একটি ভয়াবহ ব্যাধি। এমন আচরনের শিক্ষা ইসলাম কাউকেই দেয়নি, বরং ইসলাম এর শিক্ষা হলো হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হলো ছদকা। আর তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে তোমার হাসি মুখে সাক্ষাত করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়া থেকে পানি তুলে) তোমার হাসি মুখে পাত্র (কলসি ইত্যাদি) ভরে দেয়াও কল্যাণমূলক (সৎ) কর্মের পর্যায়ভুক্ত। (আমলে নাজাত আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৭৭, হা: ১; মুসনাদে আহমাদ; তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমান ভাই অপর মুসলমান ভাই এর সাথে অবশ্যই হাসি মুখে কথা বলতে হবে। এই অভ্যাসটা গড়ে তোলা প্রত্যেকের জন্য জরুরীও বটে। এই অভ্যাসের ফলে সমাজের পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক খুব সহজেই গঠিত হবে।

এখানে আরো একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন যে, যখনই সকল সময় হাসি মুখে কথা বলার প্রসঙ্গ থাকে সেখানে আরো একটি বিষয় আসতে পারে তা হলো, আল্লাহর রসূল ﷺ বেশি বেশি হাসতে নিষেধ করেছেন। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা বেশি বেশি হেসো না, কারণ বেশি হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়। (মুসনাদে আহমাদ; ইবনু মাজাহ, হা: ৪১৯৩; ছহীহ জামে, হা: ৭৪৩৫)

এ প্রসঙ্গে আব্দুল হামিদ ফায়যী সাহেব বলেন, হো-হো করে অধিক পরিমাণে হাসলে হৃদয় মৃত হয়ে যায়, কঠোর হয়ে যায়, আর তখন সে হৃদয় কারো দেয়া কোন উপদেশ গ্রহণ করে না। কারো নছিহতে তাছির হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের নাবী ﷺ এর অভ্যাস ছিলো মৃদু হাসা। (আমলে নাজাত, পৃ: ২৭৭)

✍ গীবত ও অপবাদ বর্জনীয়:

সমাজ দূষিত হবার কারণগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম আর তা হলো একজন অপর জনের গিবত করা বা অপবাদ দেয়া। এটা অতি ঘৃণিত এবং নোংরা একটি কাজ। তবে এই গিবত ও অপবাদ এমন একটি বিষয় যে, যে ব্যক্তি গিবত ও অপবাদ করবে এবং গিবত ও অপবাদ যেই ব্যক্তি শুনবে, উভয়ের নিকটেই তা খুবই মধুময় লাগবে। গিবত ও অপবাদ চলাকালীন সময় গিবত ও অপবাদকারী এবং তা শ্রবণকারী উভয়েই যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাকো। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমান হলো গুনাহের কাজ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা (গিবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাই এর গোস্ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত: তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। তোমরা আল্লাকে ভয় করো। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হজরত, আয়াত: ১২)

অন্যথায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

অর্থ: যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৮) মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই গিবত ও অপবাদ রটানো করাকে এতো কঠোরভাবে নিষেধ করার পরেও সমাজে এই ঘৃণিত পাপটি যেন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। একজন আরেক জনের নামে বিরতিহীন ভাবে গীবত ও অপবাদ করে যাচ্ছে। অথচ এই পাপের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ ও অবগত করে গেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মিরাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমনে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম যাদের ছিলো তামার নখ, যার দ্বারা তারা তাদের মুখমন্ডল বক্ষস্থল চিরে ফেলছিলো। আমি বললাম, ওরা কারা হে জিব্রাইল (আঃ)? তিনি বললেন, ওরা হলো সেই লোক যারা লোকদের গোস্ত খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায় অর্থাৎ অপবাদ দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩/২২৪; আবু দাউদ, হা: ৪০৮২) এমন গোনাহ থেকে মহান আল্লাহ আমাদের সকলকেই হেফাজত করুন।

✍ মুসলিমের গীবত খন্ডন ও সম্মান রক্ষা করার গুরুত্ব:

উপরের উল্লেখিত হয়েছে গীবত ও অপবাদকারীর সম্পর্কে। এমন লোক সমাজে কম নয় বরং বেশিই আছে। আবার এমন লোকেরই অভাব নেই যারা নেশাগ্রস্তের ন্যায় মাতাল হয়ে সেই গীবত ও অপবাদ শুনেই থাকে। অথচ তার জন্য উচিত ছিলো সেই গীবত না শুনে বরং তার প্রতিবাদ করা। কিন্তু সমাজে এই গীবত ও অপবাদকারী প্রতিবাদ করার লোক খুবই কম। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমকে সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবেন যেখানে তার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য করবে, যেখানে তাঁর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয় এবং ইজ্জত নষ্ট করা হয়। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য করবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে। (আবু দাউদ, হা: ৪৪৮৪; ছহিহুল জামে, হা: ৫৬৯০)

উপরোক্ত হাদিসটিতে আল্লাহর রসূল ﷺ সেই শ্রেণির লোকদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, যারা এক মুসলমান ভাইয়ের নামে গীবত ও অপবাদ করা দেখে কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করে এবং সেই শ্রেণির লোকদের জন্য কঠিন সতর্কের ঘোষণা দিয়েছেন। যারা এক মুসলমান ভাইয়ের নামে গীবত ও অপবাদ করা দেখে চুপ করে থাকে এবং তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই সময় সাহায্য করবেন না। যেই সময় সেই ব্যক্তি বিপদে পড়ে আল্লাহর সাহায্য পাওয়াকে পছন্দ করবে। কেননা, সেই ব্যক্তির সামনে যখন একজন মুসলমানের নামে গীবত করা হতো, অপবাদ করা হতো অর্থাৎ এক মুসলমানের সম্মানহানি করত। তখন সেই ব্যক্তি কোন প্রতিবাদ না করে চুপ থেকেছে এবং তা শ্রবণ করেছে। আর সেই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই সময় সাহায্য

করবেন। যেই সময় সেই ব্যক্তি বিপদে পড়ে আল্লাহর সাহায্য পাওয়াকে পছন্দ করেছে। কেননা, সেই ব্যক্তির সামনে যখন একজন মুসলমানের নামে গীবত করা হতো, অপবাদ দেয়া হতো অর্থাৎ এক মুসলমানের সম্মানহানি করা হতো। তখন সেই ব্যক্তি ঐ গীবতকারীর গীবতের ও অপবাদ কারীর অপবাদের প্রতিবাদ করেছে।

অন্য এক হাদিসে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটরা সময় প্রতিবাদ) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এ অধিকার পায় যে, তিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। (আমলে নাজাত, পৃ: ২৯৩, হা: ১; ছহিহুল জামে, হা: ৬২০৪)

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যেখানে যে অবস্থাতেই তার সামনে কোন মুসলমান ভাই এর নামে গীবত করা হবে ও অপবাদ দেয়া হবে, ততক্ষনাৎ ভাবেই তার কঠোর প্রতিবাদ করতে হবে। তবেই সমাজ থেকে গীবত কারী, গীবত ও অপবাদকারীর অপবাদ দূর করা সম্ভব। তবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এরূপ ঘৃনিত কাজ হলে নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হবে।

✍ ইয়াতীমদের দেখাশোনা করার গুরুত্ব:

সমাজকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে চাইলে সমাজের ইয়াতীমদের দেখা শোনা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, যখন কোন সন্তান পিতা-মাতা ছাড়া বড় হতে থাকে তখন সেই সন্তানটি পারিবারিক বন্ধন সম্পর্কে পিতা-মাতার ভালোবাসা সম্পর্কে একেবারেই জ্ঞানশূন্য থাকে। ফলে সেই সন্তানটি পারিবারিক কোন সুশিক্ষা পায় না। দিনে দিনে একেবারেই বেপরোয়া হয়ে উঠে। তখন সেই সন্তানটি সমাজে বিভিন্ন রকমের অনৈতিক কাজ, বিশৃঙ্খলামূলক কাজ করে বেড়ায়। এমন ২/১ একটি বেপরোয়া ব্যক্তি সমাজে থাকলে সেই সমাজটায় সম্পূর্ণ ভাবেই অশান্তি ছড়িয়ে রাখা অসম্ভব নয়। কাজেই একজন ইয়াতিম সন্তানকে এমন বেপরোয়া ব্যক্তি হয়ে গড়ে উঠার পূর্বেই তাদের সনাক্ত করে প্রথম থেকেই এই সকল

সন্তানদের সুন্দর ভাবে দেখা শোনার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে ইসলামের সুশিক্ষা দান করতে হবে। তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে সমাজের একজন সৎ মানুষ হিসেবে।

তাহলে তারাও হবে- সমাজকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার একজন দক্ষ কারিগর। এতে সমাজেও সৃষ্টি হবে সুশৃঙ্খল। এই সকল ইয়াতিমদের দেখাশোনা করলে যে শুধু সমাজ সংশোধনের কাজই হবে তা নয়; বরং পরকালীন জীবনেও আছে ইয়াতিমদের সঠিক ভাবে দেখা-শোনাকারীর জন্য পুরষ্কার।

হযরত সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমি ও অনাথ (ইয়াতিমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।” এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাঁক করলেন। (ছহিহ বুখারী, হা ৫৩০৪; রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৬৮, হা ২৬২)

ইয়াতিম সন্তানদের তত্বাবধায়ক যিনি হবেন তাকে দুনিয়াতেও আরো কিছু পুরষ্কার দান করবেন মহান আল্লাহ তায়ালা; সেই পুরস্কারগুলোর মধ্যে হলো:- (১) মহান আল্লাহ তায়ালা তার হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে হৃদয়কে নরম করে দিবেন।

(২) এবং তার প্রয়োজনও পূরণ করে দিবেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, “এক ব্যক্তি নাবী কারিম ﷺ এর খিদমতে এসে তার অন্তর শক্ত হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করল। তিনি বলেন, তুমি কি তোমার অন্তর নরম করতে চাও এবং তোমার আশা পূরণ করতে চাও, তাহলে তুমি ইয়াতিমের প্রতি সদয় হবে। তার মাথায় হাত বুলাবে, তোমার খাবার থেকে তাকে খেতে দিবে, এতে তোমার মনের আশা পূরণ করা হবে”। (ছহিহুল জামে, হা ৮০; আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪০২, হা ১৪)

অন্যথায় হযরত আবু মুসা (রা:) বলেন, “নাবী কারীম ﷺ বলেছেন, যে কওমের দস্তরখানে কোন ইয়াতিম খাওয়াতে অংশগ্রহণ করে, শয়তান তাদের আহারের নিকটবর্তী হতে পারে না।” (আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪০১, হা: ৬)

অন্য এক হাদিসে হযরত আবূ উমাম (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে, যতগুলো চুলের উপর তার হাত লাগাবে তাকে প্রত্যেক স্পর্শিত চুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তার নিকট অবস্থানকারী ইয়াতিমের সাথে সদাচারণ করবে, সে এবং আমি জান্নাতে এতটুকু দূরে থাকব, এই বলে তিনি তার দুই আংগুল অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলের মধ্যে ফাঁক করে দেখান। (আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪০২)

হে পাঠক! ইয়াতিমদের লালন পালন করে জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য যে, শুধু সমাজের সেই সকল ব্যক্তিদেরই আছে যারা ইয়াতিমদের লালন পালন করে তা নয় বরং সেই সকল বোনদেরও এই সৌভাগ্য রয়েছে- যারা স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোথাও আর বিবাহ না করে তাদের জন্যও রয়েছে এই পুরস্কার।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলব। তখন আমি দেখব অনেক মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। তাঁরা কারা জানতে চাইলে বলবে- আমি ঐ রমনী যে ইয়াতিমের তত্বাবধানে বিয়েহীন জীবন অতিবাহিত করেছি। (আত তারগীব ওয়াত তারগীব, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০২, হা ১২)

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াতিমরা সমাজের বোঝা নয়: বরং আমাদের জন্য জান্নাতে যাবার উত্তম একটি মাধ্যম। ইয়াতিমদের কঠোর ও খারাপ ব্যবহার করা হারাম। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হইও না। (সূরা আদ দুহা, আ ৯)

✍ বিধবা ও দুঃস্থদের দেখাশুনা করার গুরুত্ব:

সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে, সমাজের বিধবা ও অসহায় গরিব মানুষদের দেখা-শুনা করা। যা সমাজ থেকে প্রায় উঠেই গেছে অথচ এর গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নাবী করীম ﷺ বলেছেন, বিধবা ও মিসকিনদের দেখা-শুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট

আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতূল্য। আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন, সে ব্যক্তি লাগাতার রাত জাগরণকারী এবং একটানা ছিয়াম পালনকারীর মতো। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪০৫; হা: ১৯; ছহিহ বুখারী, হা: ৬০০৭; মুসলিম, হা: ২৯৮২)

✍ মুসলমানের প্রয়োজন পূরনের গুরুত্ব:

সুন্দর সমাজ গঠনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হলো- কোন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করা। যা বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় অভাব। আর যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এই অভাবটি দূর না হবে ততদিন পর্যন্ত একটি সুন্দর সুশৃংখল ইসলামী সমাজ গঠন অসম্ভব। কেননা একে অপরের প্রয়োজন পূরণ সার্বিক সহযোগীতার মাধ্যমেই সমাজের ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে ও সমাজে শৃংখলা ফিরে আসতে পারে। আজকের বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে শোনা যায়। ঋণগ্র¯ত ভ্যান চালক ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আত্বহত্যা করেছে। বিভিন্ন স্থানে মানুষ না খেয়ে অনাহারে রাস্তায় পড়ে আছে। এ সকল কিছুর জন্য শুধু দেশের সরকার দায়ী নয়। বরং এর জন্য দায়ী থাকবে এদেশের প্রত্যেকটি মুসলমান। বিশেষ করে সেই সকল জ্ঞানী আলেমরা যারা ইসলামী জ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করে। নিত্য নতুন পছন্দের খাবার খেয়ে বিলাসিতায় বুক ভাসিয়ে প্রাইভেট কারে, দামি মোটর সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসি রুমে রাত কাটাচ্ছে। এসি মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছে। আপনাদের উচিৎ ছিলো এই বিলাসিতা জীবন ত্যাগ করে দেশের অসহায় মুসলিমদের পাশে দাড়ানো। আপনার খাবারের কিছু অংশ তাদেরকে খাওয়ানো। আপনার উচিৎ ছিলো আপনার নিজের অর্থ দিয়ে একজন ঋণগ্র¯ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা। কিন্তু না এদেশের বিলাসিতা প্রিয় মুসলিমগুলো নিজ তৃপ্তি চিন্তায় বিভোর।

আমি ইতিপূর্বেও এই বিষয়টি নিয়ে ‘আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে’ বইটিতে এর বিস্তারিত অনেক আলোচনা করেছি।

আজকে মুসলিমরা মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ। মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ। কিন্তু মুসলমানদের এই বড় ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের চির দুশমন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের জন্য তাদের কাজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে এবং সফলতাও তারা পেয়েছে। একজন মুসলমান যখন অভাব-অনটনে সমাজের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ঋণের জন্য হাত পাতে মাত্র ৫/১০/১৫ হাজার টাকার জন্য। তখন সমাজের বিত্তশালীরা সেই মুসলমানের সামনে শর্ত উপস্থিত করে ১০ হাজারে ১৪ হাজার, ২০ হাজারে ২৫ হাজার ইত্যাদি। কোন উপায় না পেয়ে সেই মুসলমানটি সুদের উপর টাকা ঋণ নেয় এবং তা প্রতিমাসে বৃদ্ধিই পেতে থাকে। সুদ নামের এই মরণ ফাঁদ থেকে সেই অসহায় মুসলমানটির বেরিয়ে আসার আর কোন উপায় থাকে না। তখন সেই মুসলমানটি একজনের নিকট থেকে আরেক জনের ঋণ পরিশোধ করে এবং অপর জনের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে আবার অন্য একজনের ঋণ পরিশোধ করে। সেই অসহায় মুসলমানটির ঐ মরণ ফাঁদ থেকে যতই বাঁচার চেষ্টা করে ততই আটকিয়ে যায়। এই অসহায় মুসলমানকে এই মরণ ফাঁদ থেকে বাচানোর জন্য এদেশের বিলাসিতা প্রিয়, এসি মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতিয়োগীতায় মেতে উঠা একটি মুসলমানও তখন এগিয়ে আসে না। সবাই অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ঐ মুসলমানটির দুরবস্থা আর তখন হয়তো বন্ধুরূপী আরেকটি শয়তানী মরণ ফাঁদ এনজিও নামে অর্থাৎ সেই সকল বিভিন্ন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান যেমন: গ্রামীণ ব্যাংক, আশা ইত্যাদি এসে উপস্থিত হয় সেই মুসলিম ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য। কিন্তু সেই অসহায় মুসলিম ব্যক্তিটি তার সেই দুর অবস্থার সময় আর বুঝে উঠতে পারেনা যে, এটা সাহায্যকারী কোন বন্ধু নয় বরং নদীতে পড়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়ে বাচার জন্য প্রচেষ্ঠা কারীর হাত-পা শক্ত করে বেধে দেয়ার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান গুলির আগমন। কেননা, সেটাও এক সুদের মস্ত গাড়া। শুধু তাই নয়; বরং এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদেরকে নোবেল পুরুস্কার দিয়ে ভূষিত করে মুসলমানদের চির দুশমন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা। কারণ এই সুদের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস করে তারা মুসলমানদের ঐ চির দুশমন ইহুদি-

খ্রিষ্টানদের সাহায্য করে আনন্দ দেয়। কেননা, মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসাত্মক কাজ দেখে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা আনন্দিত হয়।

সাধারণ মুসলমানদের এমন কষ্ট থেকে, এমন ঈমান বিধ্বংসী কাজ থেকে বাচানোর জন্য এদেশের বড় বড় ইসলামী দলগুলোর নেতাদের সদইচ্ছাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা করে নাই। তারা ইচ্ছা করলে পারতো অন্তত তাদের নিজ দলের কর্মীদের মাসিক খরচের বাড়তি অর্থ ব্যাংকে রাখা থেকে বিরত রেখে নিজেদের একটি সাহায্য তহবিল গঠন করতে যেখান থেকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদে গরিব অসহায় মুসলমানদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দিতে, যাতে কোন সুদ দিতে হবে না। এমনকি নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকৃত ভাবেই ঋণ পরিশোধের প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে পাওনাদারদের কাছ থেকে কোন ভৎসনা শোনা লাগবে না। জোর পূর্বক তাদের গরু-ছাগল বিক্রয় করে বসত ঘরের টিন বিক্রয় করে নেবে না।

কিন্তু আফসোস! এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হয়তো এদেশের বড় বড় ইসলামী দলের নেতাদের মাথাতেই আসেনি। অথচ ইসলাম অতি গুরুত্বের সাথে তাগিদ দিয়েছে মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আল্লাহর নিকট কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে সেই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজ হলো, মুসলমানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করা, তার বিপদ দূর করা, তার ঋণ পরিশোধ করা, তার ক্ষুধা নিবারন করা। কারো প্রয়োজন মিটাতে গমন করা, আমার এই মাদীনার মসজিদে একমাস ইতিকাফ করার চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরন করে অথচ ইচ্ছে করলে সে তার ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে তার সাথে যায়, এমন কি সে তা তার জন্য সম্পন্ন করে দেয়, যে দিন অন্যান্য লোকেরা (বিপদের প্রচন্ডতায়) ফসকে যাবে, সে দিন আল্লাহ তার দুই পা কে স্থীর রাখবেন। (আত তারগীব

ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৫১, হা: ২২; ছহিহুল জামে, হা: ১৭৬; সিলসিলাহ সহীহাহ, হা: ১৪৯৪)

অন্য এক হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিম ব্যক্তির একটি বিপদ দূও করণে সাহায্য করবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার একটি বিপদ মুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো অভাব দূর করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে দুঃখ-কষ্ট মুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাহায্যে নিজেকে রত রাখে, আল্লাহ তাকে ততক্ষণ সাহায্য করবেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৪৫, হা: ২; মুসলিম, হা: ২৬৯৯)

✍ অন্যের দোষ ত্রুটি গোপন করার প্রতি গুরুত্ব:

গীবতের মতো এটাও অর্থাৎ অন্যের দোষ-ত্রুটি সন্ধান করে বেড়ানো ও তা প্রচার করাও সমাজের একটি মহামারী। নিত্য-নতুন একজন আরেকজনের দোষ-ত্রুটি খুজে বেড়ানো এবং তা মানুষের কাছে প্রচার করাই যেন সমাজের এক শ্রেণির মানুষের একটি কাজ। এই শ্রেণির লোকদেরকে তিরস্কার দিয়ে হাদিছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের অবস্থা এরুপ যে, তোমরা তোমাদের (মুসলিম) ভাইয়ের চোখের মধ্যেকার ক্ষুদ্র কুটাও দেখতে পাও, অথচ নিজের চোখের মধ্যে পতিত খেজুর গাছও দেখতে পাওনা। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৮৪, হা: ১২)

অন্যের দোষ খুজে প্রচার করে বেড়ানো ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ একদা মিম্বরে চড়ে উচ্চ শব্দে বলেন, হে (মুনাফিকের দল) যারা মুখে মুসলমান হয়েছে এবং যাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোনো), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিওনা, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না

ও তাদের ছিদ্রান্বেষন করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, (তা করার মতোই করেন অর্থাৎ তার কোন দোষ গোপন রাখেন না)। তিনি তাকে অপদস্থ করেন, যদিও সে নিজ গৃহের মধ্যে থাকে। (আমলে নাজাত, আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৭৪, হা: ২; তিরমিযী, হা: ২০৩২)

এরপরও সেই একশ্রেণির মানুষটি মুসলমানদের দোষ খুজে বের করে তা প্রচার করে বেড়ায়। অথচ কোন মুসলমানের কোন দোষ থাকলেও তা দেখার পর গোপনে রাখার প্রতি আল্লাহর রসূল ﷺ তাগিদ দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে বান্দা (অপরের) দোষ ত্রুটি গোপন করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ত্রুটি গোপন করে নেবেন। (মুসলিম, হা: ২৫৯০)

অপর এক হাদিসে মুসলমানদেরকে সমাজ গঠনে সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহর রসূল ﷺ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ধারনা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ ধারনা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অন্যের প্রতি অপবাদ করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না। পরষ্পর প্রতিদ্বন্দিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না, তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (আমলে নাজাত, আব্দুল হামিদ, পৃ: ২৭৪, হা: ৩; ছহিহুল জামে, হা: ২৬৭৯)

অতএব আল্লাহর রসূল ﷺ এর উপদেশ মেনে শুধু ধারনার উপর ভিত্তি করে কারো প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারনে অকারনে কারো ক্ষতির জন্য পিছে লেগে থাকা যাবে না। কারো পিছনে গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না। যারা এরুপ করে তারা যতই হক পন্থীর দাবিদার হোক না কেন বরং তাদের অভ্যাসটা মুনাফিকি অভ্যাস। এমন শ্রেণির লোকদের থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। তা ব্যতীত এই সমাজে খুব সহজেই বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে।

✍ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার গুরুত্ব:

এই আমলটা যদিও অনেক ক্ষুদ্র আমল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই আমলটি সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্ব অনেক এবং নেকী লাভেও ফজিলাতপূর্ণ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ঈমান ষাটাধিক অথবা সত্তরাধিক শাখা বিশিষ্ট। তার মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো-‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া। (ছহিহ বুখারী, হা: ৯; মুসলিম, হা: ৩৫)

অন্য এক হাদিছে হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, নাবী করিম ﷺ বলেছেন, একদা আমার নিকট উম্মাতের ভালো ও মন্দ সকল আমল পেশ করা হলো- তার ভালো আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর তার মন্দ আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম মসজিদে ফেলা কফকে পরিষ্কার না করা। (মুসলিম, হা: ৫৫৩)

✍ কারো বাড়িতে উঁকি মারা নিষেধ:

সমাজের মানুষের সাথে চলা চলের সময় অবশ্যই এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বভাবে দেখতে হবে। গরিব হোক, ধনি হোক যে কোন বাড়িতেই প্রবেশের সময় অবশ্যই বাড়ির মালিকের অনুমতি নিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করতে হবে। হুট-হাট করে কোন বাড়িতেই ঢুকে পড়া যাবে না। কারো বাড়ির দেয়ালের পাশে কান পেতে দাড়ানো যাবে না। কারো বাড়ির দেয়ালের কোন ছিদ্র দিয়ে বাড়ির ভেতরে উঁকি মারা যাবে না। অতএব কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই বাড়ির মালিকের অনুমতি নিতে হবে। মহান আল্লাহ তা’য়ালার বিধান। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীর অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা নূর, আয়াত: ২৭-২৮)

আবার অনেকেই একথা বলে থাকে বাড়ির ছেলে বড় হলে সেই বাড়িতেই প্রবেশ করতে কি তার অনুমতি নেয়া লাগবে? হ্যাঁ-যদি কোন সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, সেই সন্তান বাড়িতে প্রবেশ করতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে এবং পিতা-মাতার গৃহে প্রবেশের সময় অবশ্যই অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾

অর্থ: তোমাদের সন্তানগণ বয়সপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়স্কদের মতো অনুমতি প্রার্থনা করে। (সূরা, নূর, আয়াত: ৫৯)

এই বিধানটি এই জন্য যে, সেই সন্তানটি জানে না গৃহের ভেতরে তার পিতা-মাতা কি অবস্থাতে আছে। অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ করলে হয়তো তার দৃষ্টি এমন কিছু দেখতে পারে যা তার জন্য দেখা উচিৎ নয় এবং লজ্জাজনক।

হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, অনুমতি তো দৃষ্টির জন্যই করা হয়েছে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬২৫০; মুসলিম, হা: ২১৫৫)

উপরে উল্লেখিত হাদিসটি মূলত এমন লোকদের জন্য উল্লেখিত হয়েছে যারা কোন বাড়িতে প্রবেশের জন্য বাড়ির মালিকের অনুমতি নেয় অথবা অনুমতির

অপেক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু বাড়ির গেটের কোন ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে বাড়ির ভেতরের অবস্থাও দেখতে থাকে, কেউ বাড়ির গেট খুলে দিতে আসছে কিনা। এই অভ্যাসটা অত্যান্ত নিন্দনীয়। অত:পর যেই সকল লোক কোন বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি না নিয়ে বাড়ির দেয়ালের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে চোরের মতো বাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখতে থাকে তাদের ব্যাপারে হাদিছ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে, সে ব্যক্তির চোখে ঢিল ছুঁড়ে তাকে কানা করে দেয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬৮৮৮; মুসলিম, হা: ২১৫৮)

আবার অনেকেই দেখা যায় ঘরে দেয়ালের পাশে দাড়িয়ে ঘরের ভেতরের কথা শুনছে, এটাও নিন্দনীয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় দুইজন মানুষ এক স্থানে দাড়িয়ে থেকে বা বসে কোন গল্প করছে, তাদের পাশে আর একজন দাড়িয়ে থেকে তাদের কথা শুনাও নিষেধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী করিম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে আর তারা তা পছন্দ করে না, সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে। (ছহিহ বুখারী, হা: ৭০৪২)

✍ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করার ফজিলত:

সমাজে বসবাসরত মানুষদের নিয়মিত খোজ খবর নিতে হবে। তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের সুখে-দুখে, রোগে শোকে সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদের পারিবারিক অবস্থা, শারিরিক অবস্থা বিভিন্ন বিষয়ের খোজ খবর রাখতে হবে। এই সাক্ষাত সুন্দর সমাজ গঠনে যেমন জরুরী, তেমনী সেচ্ছায় সাক্ষাতকারীদের ফজিলাতও রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ভ্রাতৃত্ব

স্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সেই ব্যক্তি কে এক (গায়েবী আহব্বানকারী) বলে, 'সুখী হও তুমি', সুখময় হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে। (তিরমিযী, হা: ১৬৩৩)

✍ অসুস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করে তাকে সান্তনা দেয়ার গুরুত্ব:

একে অপরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠার এটি একটি অন্যতম পদ্ধতি। এটির ফলে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় এবং সামাজিক জীবনে এর একটি সুন্দর প্রভাব পড়ে। যেই প্রভাব দ্বারা সমাজের বিশৃংখলা দূর হয়। এছাড়াও এই সাক্ষাতকারীর অর্থাৎ যারা অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে সান্তনা দেয়ার জন্য যায় তাদের জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নাবী করিম ﷺ বলেছেন, যখনই কোনো ব্যক্তি সন্ধাবেলায় কোনো রোগীর সাথে সাক্ষাত করতে যায়, তখনই তার সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলায় রোগীর সাথে দেখা করতে আসে, সে ব্যক্তির সাথেও ৭০ হাজার ফেরেশতা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। (আমলে নাজাত, আব্দুল হামিদ ফায়যী, পৃ: ২৬৪, হা: ২; ছহীহুল জামে, হা: ৫৭১৭)

আর যারা অবহেলা করে কোন রোগীর সাথে সাক্ষাত করে সান্তনা টুকুও দিতে চায় না, তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান; আমি অসুস্থ ছিলাম অথচ তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করনি! মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক; কেমন করে আপনার (অসুস্থতাও) সাক্ষাত সম্ভব ছিলো, কারণ আপনি তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তা! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো? তুমিতো তার সাথে স্বাক্ষাত করে সান্তনা

দাওনি। তুমি কী জানতে না যে, যদি তুমি তাকে স্বাক্ষাত দিতে তাহলে তার নিকটেই আমাকেও পেতে? (মুসলিম, হা: ২৫৬৯)

✍ রোগীর জন্য দু'আ করার গুরুত্ব:

অসুস্থ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ করা জরুরী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী করিম ﷺ বলেছেন, মৃত্যু উপস্থিত হয়নি এমন রোগীর সাথে স্বাক্ষাত করে ৭ বার নিম্নের দু'আ বললে, আল্লাহ ঐ রোগ থেকে ঐ রোগীকে নিরাপত্তা দান করেন- 'আসআলুল্লোহুল আজি-ম-রব্বাল আরশিল আ'জ্বীম-আই ইয়াশ ফি ইয়াকা'।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহ, মহা আরশের অধিপতির নিকট প্রর্থনা করি যে, তিনি তোমাকে (এ রোগ হতে) নিরাময় করুন। (আবু দাউদ, হা: ২৬৬৩)

✍ সত্য প্রচারক ভালো ব্যক্তিদেরই অধিক শত্রু এবং তাদেরকে নিয়েই সমাজ বা জন সমাগমে অধিক সমালোচনা ও কঠিন ষড়যন্ত্র:

প্রিয় পাঠক! ইসলামী আদর্শে আদর্শিক সুন্দর সমাজ গঠন করার প্রচেষ্টাকারীদের বা সত্য প্রচারকদের জন্য সমাজের বা জন সমাগমে অধিক সমালোচনার মুখে পড়তে হবে এবং তাদেরকে নিয়েই বিভিন্ন মহলে কঠিন ষড়যন্ত্র হবে এটাই স্বাভাবিক। সত্য প্রচারক ভালো ব্যক্তিগণই হয় সমাজের লজ্জাশীল ব্যক্তি, নরম স্বভাবের মানুষ। তারা যে কোন বিতর্ক-বিশৃংখলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। অথচ সেই সকল ব্যক্তিদেরই নিয়ে জনসমাগমে লজ্জাহানীর জন্য উঠে অধিক সমালোচনার ঝড়। এটা আজকে নতুন নয়; বরং নাবী-রাছুলগণ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে। সর্বশেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর বেলায়ও হয়নী তার ভিন্নটা। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ এর পালিত পুত্র যায়িদ বীন হারিস (রাঃ) এর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যায়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) কে বিবাহের পর হয়েছিলো। মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ সাহেব সেই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, হযরত যায়নাব (রাঃ) এর সাথে আল্লাহর রসূল ﷺ এর বিয়ে তো হয়ে গেল। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা বড় হৈ

চৈ করে বাজার গরম করে তুললো এই বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পুত্র বধুকে বিয়ে করেছেন, অথচ তাঁর নিজের উপস্থিতিতে শরীয়াতের আইনে পুত্র বধুকে বিয়ে করা পিতার জন্য হারাম করা হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেন সূরা আল-আহযাবের ৪০ তম আয়াত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾

অর্থ: (হে জনগণ) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয় বরং আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নাবী মাত্র। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। (আসহাবে রসুলের জীবন কথা, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৫৫)

অনুরূপ ভাবে আরো একটি ঘটনা ঘটে ছিলো উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বিষয়েও ইসলামের চুড়ান্ত দুশমনরা পবিত্র নারী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রতিও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জনসমগমে কঠোর সমালোচনা করতে বাদ রাখেনি। ঘটনাটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

শাইখুল হাদিস আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহ:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিয়ম ছিলো সফরে যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করে নিতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠত তাঁকে তিনি সফরে নিয়ে যেতেন। বনু মুসত্বালাক যুদ্ধে এর এই অভিযান কালে লটারীতে হযরত আয়িশা (রাঃ) এর নাম বের হয়। সেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যান। এ অভিযান শেষে মদিনা ফেরার পথে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হয় শিবিরে থাকা অবস্থায় হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ প্রয়োজনে শিবিরের বাহিরে গমন করেন। সফরের উদ্দেশ্যে যে স্বর্ণহারটি তাঁর বোনের নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন এ সময় তা হারিয়ে যায়। হারানোর সময় হারের কথাটি তাঁর স্মরণেই ছিলো না। জরুরত থেকে শিবিরে ফিরে আসার পর হারানো হারের কথাটি স্মরণ হওয়া মাত্রই তার খোজ তিনি পুনরায় পূর্বস্থানে গমন করেন। এসময়ের মধ্যেই যাঁদের উপর নাবীর স্ত্রী (রাঃ) এর হাওদা উঠের পিঠে উঠিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত ছিল

তাঁরা হাওদা উঠিয়ে দিলেন। তাদের ধারনা যে, উম্মুল মূমিনিন হাওদার মধ্যেই রয়েছেন। যেহেতু তাঁর শরীর খুব হালকা ছিল সেহেতু হাওদা হালকা থাকার ব্যাপারটি তাঁদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া করেনি। তাছাড়া, হাওদাটি দু'জনে উঠালে হয়তো তাঁদের পক্ষে অনুমান করা সহজ হতো এবং সহজেই ভুল ধরা পড়তো। কিন্তু যেহেতু কয়েকজন মিলে মিশে ধরাধরি করে হাওদাটি উঠিয়েছিলেন। তাই ব্যাপারটি অনুমান করার ব্যাপারে তাঁরা কোন ভ্রূক্ষেপই করেননি।

যা হোক হারানো হারটি প্রাপ্তির পর মা আয়িশা (রাঃ) আশ্রয়স্থলে ফিরে এসে দেখলেন যে, পুরো বাহিনী ইতিমধ্যে সে স্থান পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন। প্রান্তরটি ছিলো সম্পূর্ণ জনশূন্য। সেখানে না ছিলো কোন আহব্বানকারী, না ছিলো কোন উত্তর দাতা। তিনি এ ধারনায় সেখানে বসে পড়লেন যে, লোকেরা তাকে যখন দেখতে না পাবেন তখন তাঁর খোঁজ করতে করতে এখানেই এসে যাবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপন কাজে সদা তৎপর এবং প্রভাবশীল। তিনি যেভাবে যা পরিচালনা করার ইচ্ছা করেন সে ভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়।

অতএব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মা আয়িশা (রাঃ) এর চক্ষুদ্বয়কে ঘুমে জড়িয়ে দেয়ায় তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। অত:পর সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল (রাঃ) এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি বলছিলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন, রাসুলে কারীম ﷺ এর স্ত্রী? সাফওয়ান (রাঃ) সেনাদলের শেষ অংশে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো একটু বেশী ঘুমানো। আয়িশা (রাঃ) কে এই অবস্থায় দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারলেন। কারণ পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। অত;পর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন, পাঠরত অবস্থায় তিনি আপন সওয়ারীকে নাবীর স্ত্রী (রাঃ) এর নিকট বসিয়ে দিলেন। মা আয়িশা (রাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহণ করার পর সাফওয়ান (রাঃ) তিনি তার লাগাম ধরে টানতে টানতে হাঁটতে থাকলেন এবং সর্বক্ষণ মুখে উচ্চারণ করতে থাকলেন ইন্না লিল্লাহি-----------। সাফওয়ান (রাঃ) ইন্না লিল্লাহি-------ছাড়া অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করেননি। তিনি মা আয়িশা

(রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে যখন সৈন্যদলে মিলিত হলেন, তখন ছিলো ঠিক খরতপ্ত দুপুর। সৈন্যদল শিবির স্থাপন করে বিশ্রামরত ছিলেন। মা আয়িশা (রাঃ) কে এ অবস্থায় আসতে দেখে লোকেরা আপন আপন প্রকৃতি ও প্রকৃত্তির নিরিখে ব্যাপরটি আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকলেন।

সৎ প্রকৃতির লোকেরা এটাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করল। কিন্তু অসৎ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লোকেরা এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে থাকল নানা ভাবে। বিশেষ করে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ এর দুশমন অপবিত্র খবিশ আব্দুল্লাহ বিন উবাই এটিকে পেয়ে বসল তার অপপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। সে তার অন্তরে কপটতা, হিংসা, বিদ্বেষের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখে ছিলো এ ঘটনা তাতে ঘৃতাহুতির ন্যায় অধিকতর প্রভাবিত ও প্রজ্জ্বলিত করে তুলল। সে এ সামান্য ঘটনাটিকে তার স্বপরিকল্পিত নানা আকার, প্রচার ও রংঢং এ বিচিত্র ও রঞ্জিত করে ব্যাপক ভাবে অপপ্রচার শুরু করে দিলো।

পূন্যের তুলনায় পাপের প্রভাবে মানুষ যে সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এ সত্যটি আবারও অত্যন্ত নিরঙ্কুশ ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এ অপপ্রচারে অনেকেই প্রভাবিত হয়ে পড়ল এবং তারাও অপপ্রচার শুরু করল। এমনি দ্বিধাদ্বন্দ ও ভারাক্রান্ত মনমানসিকতা সম্পন্ন কাহিনীসহ আল্লাহর রসূল ﷺ মদিনায় ফিরলেন মুনাফিকরা মদিনায় ফেরার পথে আরো জোটবদ্ধ হয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিলো। এ অপবাদ ও অপপ্রচারের মুখোমুখী হয়ে রসূল ﷺ ওয়াহীর মাধ্যমে এর সমাধানের আশায় অপেক্ষা করলেন। (আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৩৭৯-৩৮০)

হে প্রিয় পাঠক! সমাজের নরদমার কীট এই মুনাফিক শ্রেণির লোকেরা এমন চরিত্রবান ও সর্বশ্রেষ্ট আদর্শবান, মহা মানব আল্লাহর নাবী ﷺ ও তাঁর স্ত্রী (রাঃ) কে নিয়েও সমাজে ও জনসমাগমে অধিক সমালোচনার ঝড় তুলতে দ্বিধাবোদ করেনি। অতএব যখন আপনি বাতিল সমাজ পরিবর্তন করে সুন্দরতম ইসলামী

সমাজ গড়তে যাবেন, যখন প্রকৃত ইসলামের সত্য প্রচারক আপনি হবেন, তখন ইসলামের লেবাসধারী সমাজের নরদমার কীট এই মুনাফিকদের সাথে আপনার পরিচয় হবে-এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আপনি জেনে রাখুন এই মিথ্যাবাদি মুনাফিকরা আপনার চলার পথে বাধাগ্রস্থ করার জন্য আপনাকে নিয়ে সমাজ ও জনসমাগমে এমন নাটকীয় অভিনয় করবে যা দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। আর সাধারণ মানুষগুলোর কথাতো আছেই-যাদের অধিকাংশই গীবত শ্রবণে নেশাগ্রস্থ। তখন আপনাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে আর সেই কথাটিই বলতে হবে যেই কথাটি বলেছিলেন উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়িশা (রাঃ) তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আপনারা যে কথা শুনেছেন তা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং আপনারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এ কারণে আমি যদি বলি যে, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র আছি এবং আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি পবিত্র আছি, তবুও আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবেন না। আর যদি আমি ঐ জঘন্য অপবাদকে সত্য বলে স্বীকার করে নেই অথচ আল্লাহ তা'য়ালা অবগত আছেন যে, আমি তা থেকে পবিত্র আছি তবে আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা ইউসুফ (আঃ) এর পিতা বলেছিলেন ধৈর্য ধারণই উত্তম পথ এবং যা বলছ তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮)

অতএব সত্য প্রচারকদেরকে অধিক ধৈর্যের পথটিই অবলম্বন করতে হবে। যেই ধৈর্যকে বলা হয় 'ছবরুন জামীল'। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮)

অত:পর ধৈর্য ধারণ করেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অনুরুপ ভাবে সত্য অনুসন্ধানকারী মুসলমানদেরও উচিৎ যাদের ভেতরে আল্লাহর ভয় আছে। যেখানে সেখানে যার তার কথা শুনেই যে কোন অপবাদকে বিশ্বাস না করে, যেই সত্য প্রচারকের নামে অপবাদ করা হচ্ছে তার সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা থেকে থাকলে তাঁকে যাচাই করা।

হে প্রিয় পাঠক! আপনি যখন সত্য প্রচার করতে যাবেন, বাতিল সমাজেকে পরিবর্তন করে সুন্দরতম ইসলামী সমাজ গঠন করতে যাবেন, তখন সমাজ বা জনসমাগমে আরো কয়েক শ্রেণির লোকের সাথে আপনার সাক্ষাত হবে। যারা চায় না প্রকৃত সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা আপনার পথে বাধা দানের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবে। যেমনটি সর্ব উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথেও হয়েছে। তার একটি হলো-

✍ কটাক্ষ্য:

আপনি যখন সত্য প্রচারের জন্য ইসলামের চিরন্তন সত্যগুলি সমাজ বা জনসমাগমে তুলে ধরবেন। ইসলামের প্রকৃত দাবী উপস্থাপন করবেন, তখন তারা আপনাকে পাগল, বুদ্ধিহীন বলে কটাক্ষ্য করবে। আপনাকে মিথ্যুক বলে সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। যখন আপনার সত্যবাদিতার অনেক কথায় সত্যে পরিনত হবে তখন আপনাকে ভেলকিবাজি বলবে। তবে এর কোনটাই নতুন নয় এমন অসভ্য আচরণ আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথেও করা হয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে শাইখুল হাদিছ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহিঃ) বলেন, বিভিন্ন অপমানকর উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নাবী কারীম ﷺ কে তারা জর্জরিত এবং অতীষ্ঠ করে তুলতে চাইলো এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে ছিলো মুসলিমগণকে সন্দেহ পরায়ন, বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে তাঁদের উদ্যম ও কাজের স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়া; এ উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ আল্লাহর রসূল ﷺ কে অশালীন অপবাদ এবং গালি গালাজ করতেও কুণ্ঠবোধ করেনি। তারা কখনো তাঁকে পাগল বলেও সম্বোধন করতো। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে- উহারা বলে, ওহে ঐ ব্যক্তি! যাঁহার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, তুমিতো নিশ্চয় উন্মাদ। (সূরা হিজর, আয়াত: ৬) কখনো কখনো তারা নাবী ﷺ কে যাদুকর বা ভেলকিবাজী বলতো এবং মিথ্যার অপবাদও দিতো। যেমন ইরশাদ হয়েছে- আর তারা (এব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্যে হতে

একজন সতর্ককারী এসেছে, কাফেররা বলল-এটা একটা যাদুকর মিথ্যুক। (সূরা ছোআদ, আয়াত: ৪) (আর-রহীকুল মাখতুম, পৃ: ১১০)

হে প্রিয় পাঠক! যখনই আপনি সত্য প্রচারক হবেন, সমাজ বা জনসমাগমে অন্যায় অবিচার, বেইনসাফি দেখে যখনই আপনি তাদের সামনে কুরআনের ইনসাফপূর্ণ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনাবেন, তখনই আপনার দেখা হবে সমাজ বা জনসমাগমের আরেক শ্রেণির মানুষের সাথে যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, সে তো অবশ্যই পাগল। (সূরা ক্বলাম, আয়াত: ৫১)

শুধু এটাই নয় বরং যারা আপনার সত্য কথাগুলোকে মেনে নিবে এবং সত্য প্রচারে আপনাকে সাহায্য করবে তাদেরকে নিয়েও এক শ্রেণির লোক উপহাস করবে। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে- এরা কী সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ কী তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে অধিক অবগত নন? (সূরা আন-আম, আয়াত: ৫৩)

ঐ শ্রেণির লোকেরা এই সকল কথা বলে তাদেরকে উপহাস করতো যাঁরা ছিলো হতো দরিদ্র, গরিব, অসহায়, মাজলুম শ্রেনির মানুষ অথচ তাঁরা আল্লাহর নাবী ﷺ এর মুখে সত্যের দাওয়াত শুনে তা গ্রহণ করে নিয়েছিলো। এমন সত্য গ্রহণকারী হতদরিদ্র মাজলুম আপনি যুগে যুগেই পাবেন। আর ঐ উপহাসকারী জালিমদেরকেও পাবেন যুগে যুগেই। ঐ শ্রেনির জালিমগুলো যে, শুধু তাঁদেরকে উপহাস করেই চুপ থাকতো তা নয়, বরং তাঁদেরকে দেখে একজন আরেকজনকে চোখ টিপিয়ে দেখিয়ে দিতো। তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো যে, এই হলো সত্যগ্রহণকারী। শুধু এতো টুকুই নয়-ঐ জালিমরা সত্য গ্রহণকারীদের তো ঠাট্টা করতোই তা ছাড়াও তারা বাড়িতে গিয়ে স্বজনদের নিকট গল্প করে আনন্দ

পেতো যে, তারা সত্য গ্রহণকারীদের নিয়ে ঠাট্টা করেছে-অপমান করেছে। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

অর্থ: পাপাচারী লোকেরা (দুনিয়ায়) মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো আর তাঁরা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করতো। আর তাঁরা যখন তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে আসতো, তখন (মু'মিনদেরকে ঠাট্টা করে আসার কারণে) উৎফুল্লা হয়ে ফিরে আসতো। আর তারা যখন মু'মিনদেরকে দেখতো তখন বলতো, এরাতো একেবারে গুমরাহ। আর তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাজাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ২৯-৩৩)

হে প্রিয় পাঠক! প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করার কারণে আপনাকে কথায় কথায় গুমরাহি বলার ও আপনাকে নিয়ে হাসি তামাশা করার এক শ্রেনির মানুষের সাথে সমাজ বা জনসমাগমে আপনার পরিচয় হয়ে যাবে। তাদের কথা শুনে, তাদের আচরণে আপনার মন এতোটাই ব্যথিত হবে যে, সময় সময় আপনার মন সংকুচিত হয়ে যাবে। শুধু এটা আপনার ক্ষেত্রেই হচ্ছে তা নয়; বরং বিশ্ব জগতের জন্য রহমাত স্বরূপ আগমনকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নাবী ও রসুল মুহাম্মাদ ﷺ এর ক্ষেত্রেও হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই চিত্রকে তুলে ধরে বলেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

অর্থ: আমি জানি, তারা যেসব কথা বার্তা বলে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়। (সূরা হিজর, আয়াত: ৯৭)

এই আচরণটি তারা শুধু যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথেই করেছে তা নয়; বরং তাঁর পূর্বে আগমনকারী অনেক নাবী-রসূল (আঃ)-দের সাথেও করেছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ ﷺ-কে সান্তনা দিয়ে বলেন,

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۰﴾

অর্থ: তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অত:পর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল। (সূরা আন'আম, আয়াত: ১০)

অতএব আমার আপনারও ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। সত্য প্রচারকদের জীবনে এই ঘটনাগুলো নতুন নয়।

হে প্রিয় পাঠক! আপনি যখন সত্য প্রচারক হবেন, বাতিল সমাজকে পরিবর্তন করে, সুন্দরতম ইসলামী সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা করবেন, তখন সমাজ বা জনসমাগমে আপনার সাক্ষাত মিলবে আরো এক শ্রেনির লোকের সাথে, যাদের কাজ হবে আপনার সত্য প্রচারকে প্রতিহতো করার জন্য আপনার প্রতি মানুষের মনে সংশয় সন্দেহের উসকানী দেয়া।

✍ সংশয়-সন্দেহের উসকানী দেয়া:

যখনই আপনি সত্য প্রচারক ও প্রতিষ্ঠা করাকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নিবেন, তখন এই শ্রেনির মানুষগুলো আপনার পিছনে উঠে-পরে লাগবে। আপনি হয়তো ভাববেন, কি ব্যাপার? আমি তো কাউকে লাড়ি নাই, আমি তো কারো কোন ক্ষতি করি নাই, তবে তারা কেন সর্বদা আমার পিছনে পড়ে আছে? আপনার পিছনে তাদের লেগে থাকার কারণ তারা আপনাকে জনসমাগমে ইসলামের সত্য কথাটি প্রচার করতে দিবে না। কেননা, যখন আপনি সেই সত্যটিই প্রকাশ করতে

চাইবেন, যা তারা ব্যক্তি স্বার্থে গোপন রেখেছে, তখন ঐ শ্রেণির লোকদের নেতৃত্বে ভাটা পড়ে যাবে। তারা তাদের অনুসারীদের কাছে বার বার প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। যার কোনো উত্তরই তাদের কাছে নাই। এই অবস্থায় যদি তারা সেই সত্যটাকে মেনে নেয় তবে তাদের আত্বসম্মানে আঘাত লাগবে। এমন কি তাদের ভক্তদের কাছে তাদের ইলম-আমল নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কাজেই তারা তাদের সম্মান ও নেতৃত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনার সত্য কথাটিকেই তারা অস্বীকার করবে। হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং সে তার ভক্তদেরকে সাত, পাঁচ, তের বুঝিয়ে আপনার পেছনে লাগিয়ে দিবে, সে নিজেও লাগবে। তখন তাদের একমাত্র লক্ষ উদ্দেশ্য থাকবে জন সাধারনের মনে আপনার প্রতি সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া যেন মানুষ আপনার কাছে না ভিড়ে, আপনার কথা না বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে তাদের প্রথম হাতিয়ারই হবে আপনার শিক্ষা-দিক্ষা। যদি আপনি আলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি হন, তবে তারা বলবে, আলিয়া তার সব কিছু খালিয়া। সে আর কুরআনের কি দাওয়াত দিবে? সুতরাং খালিয়ার কথা মাথায় নেয়া যাবে না। যদি আপনি হন কওমি শিক্ষিত তবে তারা বলবে, কওমি কম ইলেম সম্পূর্ণ। সে আর সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, আন্তর্জাতিক বিষয়ে কুরআন হাদিছের কী বুঝাবে? সুতরাং কম ইলেম সম্পূর্ণ লোকের কথা মাথায় নেয়া যাবে না। যদি আপনি হন জেনারেল শিক্ষিত তবে তারা উভয়েই আপনাকে দাঁতের ডাক্তার, পেটের ডাক্তার, অমুক মাষ্টার, তমুক দোকানদার, প্যান্ট পরা মুফতি ইত্যাদি নামে কটাক্ষ করে কথা বলবে, আর বলবে এরা তো কুরআনই ভালো ভাবে পড়তে পারে না। কুরআন হাদিছের ব্যাখ্যা কি বুঝবে? এদের কথা মাথায় নেওয়া যাবে না। এদের অনেকেই আবার কট্টর উপহাস করে বলবে, নাড়া আরবীর বড় বড় কেতাব গুলো এদের পড়াতো দূরের কথা মাথায় তুলে দিলেও নিয়ে যেতে পারবে না। সত্য প্রচার কিভাবে করবে? আর যদি আপনি জেনারেল শিক্ষিত এর ৬ ডিগ্রি না থাকে, মাদ্রাসা শিক্ষিত ডিগ্রি না থাকে, ডিগ্রি ছাড়া এমনিতেই কোন ওস্তাদের কাছে শিখে এবং নিজের কঠোর পরিশ্রম আর চেষ্টায় কুরআন হাদিস বুঝে আমল করেন এবং তা প্রচার করেন, তাহলে তো আর কোন কথা নেই।

তখন সরাসরিই বলবে মূর্খ আর কুরআন-হাদিসের কি বুঝে? তার কথায় কোন কান দেয়া যাবে না, তার শিক্ষাগত কোন যোগ্যতা নাই। এমন নানান কথা তারা সমাজ বা জনসমাগমে প্রচার করে বেড়াবে যেন সাধারন মানুষ ভেবে নেয় যে, সত্য তো! সেতো বড় ডিগ্রি ধারী কোন ব্যক্তি না, তার কথায় কান দেয়া যাবে না। অথচ ইসলামের মূলনীতি হলো তুমি যা জানবে তা অপরের কাছে পৌঁছে দিবে। অর্থাৎ আপনি ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানবেন তা অপরের নিকট পৌছে দিবেন। আপনি যদি ছলাত বিষয়ে ভালো ভাবে জানেন তবে আপনি ছলাত বিষয়টিই প্রচার করুন। যদি আপনি যাকাত সম্পর্কে জানেন তবে আপনি যাকাত সম্পর্কে প্রচার করুন। যদি আপনি শেষ জামানা সম্পর্কে জানেন তবে আপনি শেষ জামানা সম্পর্কে প্রচার করুন। আপনি যেটা সঠিক ভাবে জানেন সেটাই আপনি প্রচার করুন। এটার জন্য আপনাকে মুফতি, মুহাদ্দিছ, বড়বড় ডিগ্রি ওয়ালা ব্যক্তি হওয়া লাগবে না। এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ভাবে ও সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন, ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল আরিফী সাহেব-তিনি উক্ত আলোচনা সম্পর্কে প্রথমেই একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর মদিনায় হিজরতের পর যখন ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দেশে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)দের ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য পাঠিয়েছেন। মিশর, ইয়ামেন, ইরাকসহ আরো অনেক রাষ্ট্রেই আল্লাহর রসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সাহাবিদের প্রেরণ করে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামগন (রাঃ) সেখানের মানুষদের ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন।

ওযাদীয়ে নোমান অঞ্চলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের পাঠালেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। ওয়াদীয়ে নোমান অঞ্চলটি মক্কা এবং তায়েফের মাঝামাঝি একটি জায়গায় অবস্থিত। বর্তমানে যেটি হাদা রোড এ অবস্থিত। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের ওয়াদীয়ে নোমানে পাঠানোর পূর্বে বলেছেন- তোমরা সেখানে মরুভূমির মাঝে এক বেদুইন সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে যারা লাত ও উজ্জার ইবাদত করে। মূর্তি পূজা করে এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

তোমরা তাদের কাছে যাও, তাদেরকে একতত্ত্ববাদের দাওয়াত দাও এবং মর্যাদা সম্পন্ন পথের দিকে আহ্বান করো। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামগণ সেই দিকে যাত্রা করলেন। যখন সাহাবায়ে কেরামগণ ওয়াদীয়ে নোমানে পৌছালেন তখন তাঁরা এক বেদুঈন সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। যারা তাদের উট, ছাগল এবং ভেড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করার তাদের কোনো ইচ্ছাই ছিলো না। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন এবং একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের আহ্বান জানালেন। তাদেরকে মূর্তিপুজা থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান করা হলো, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারা বলল, আমরা কিভাবে আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করতেন তাদের ইবাদত ছেড়ে দিয়ে এমন ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেবো যে কিনা আমাদেরকে নতুন কোন ধর্মের দিকে ডাকে এবং এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলে। তাদের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র একজন ছাড়া আর সবাই এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং এই দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকার জানালো। ফলে সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁদের উটকে মদিনার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিল, তিনি তায়েফ থেকে মাদিনার দিকে রওনা হলো। তায়েফ থেকে মদিনার দূরত্ব ৫০০ কিলোমিটার। যখনই উক্ত বেদুইন মদিনায় পৌছালো তখন তিনি শুধু ডানে-বামে তাকাতে থাকলেন। কারণ দ্বিধাদ্বন্দে ছিলেন, তিনি জানতেন না তাকে কোথায় যেতে হবে। তাই বেদুঈন লোকটি মদিনার লোকদের জিজ্ঞেস করলো তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি কোথায় যে নিজেকে নাবী হিসেবে দাবী করেছে? তারা তাঁকে জানালো যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী দাবি করেছে সে মসজিদে অবস্থান করছে। সুতরাং বেদুঈন লোকটি মসজিদের দিকে আসলো এবং তার উটকে মসজিদের দরজায় বাঁধলো। যখন তিনি মসজিদে প্রবশে করলেন তখনো তিনি চার দিকে দেখতে লাগলেন, কারণ তিনি কাকে কি বলবেন তা বুঝতে পারছিলেন না এবং তিনি যিনি নিজেকে নাবী দাবি করছেন তাকেও চিনতেও পারছিলেন না। তখন তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন কোথায় তিনি যিনি নিজেকে নাবী দাবি

করেছেন? কোথায় মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ? তখন লোকজন তাকে সাদা সুন্দর দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকা এক লোকের দিকে নির্দেশ করে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ইনিই মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্। বেদুঈন লোকটি একটি সন্দেহের দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলো- ইনিই কি তিনি, যিনি নিজেকে নাবী দাবি করেছেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললো, হ্যাঁ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজেকে নাবী দাবী করেছেন। তখন লোকটি নবীজির দিকে এগিয়ে গেলেন, নবীজি ﷺ এর চারদিকে ঘিরে তখন আমরা অবস্থান করছিলাম। কিন্তু উক্ত বেদুঈন লোকটি তখন আমাদের সকলকে ডিঙিয়ে সামনে এগোতে লাগলো এবং নবীজি ﷺ এর কাছাকাছি চলে গেলো। এক সাহাবি বর্ণনা করেন, আমরা লোকটির আওয়াজ শুনেছি কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি লোকটি কি বলতে চাইছে। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামগণ তার দিকে তাকালো। দেখতে পেলো লম্বা দুটি ঝুটিওয়ালা চুল বিশিষ্ট এক বেদুইন। বেদুইন লোকটি আরো সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো, যতক্ষণ পর্যন্ত বেদুইন লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ এর মুখোমুখি না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সামনের দিকে এগোতে থাকলো।

আল্লাহর রসূল ﷺ এর মুখোমুখি হয়ে বেদুইন লোকটি খুব ভালোভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখতে লাগলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মাদ ﷺ? নাবী ﷺ উত্তর দিলেন, আমিই মুহাম্মাদ। তখন বেদুইন লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলো আপনিই কি নিজেকে নাবী দাবি করেছেন? নাবী ﷺ বললেন- হ্যাঁ, আমিই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নাবী ও রসূল। আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো কিন্তু আমি এই প্রশ্নগুলো ক্ষেত্রে আপনাকে খুবই খুটিনাটি প্রশ্ন করবো এবং আপনার সাথে খোলামেলা আলোচনা করবো। সুতরাং আপনি আমার উপর রেগে থাকবেন না। অন্য ভাবে বললে, বলতে হয় এই বেদুইন হয়তো বলতে চেয়েছেন যে, আমি একজন বেদুইন কথা বলার রীতিনীতি আমার জানা নেই এবং আমি খুব বেশি সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পরিনা। আমার সম্প্রদায়ের সাথে আমি যেভাবে কথা বলি আপনার সাথে কথা বলতে গিয়েও আমি ঠিক সে

ভাবেই কথা বলব, এতে আপনি আমার উপর হতাশ বা রাগ করবেন না। নাবী ﷺ তখন তাকে বললেন, তুমি যা জানতে চাও তা জিজ্ঞেস করো। বেদুইন লোকটি তখন আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল হে মুহাম্মাদ! কে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছে? আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা। বেদুইন লোকটি এবার জিজ্ঞেস করলো, হে মুহাম্মাদ! কে পাহাড় সমূহকে বিস্তর করে দিয়েছেন? আল্লাহার রসূল ﷺ অনুরুপ উত্তর দিলেন। তখন বেদুইন লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললেন, যে আল্লাহ আকাশ সমূহকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন, যে আল্লাহ পাহাড় সমূহকে বিস্তৃত করেছেন, সেই আল্লাহই কী আপনাকে আমাদের কাছে নাবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন? আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! তিনিই আমাকে নাবী ও রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তখন বেদুইন লোকটি বললেন, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আপনাকে নাবী হিসেবে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আপনি আমাকে বলুন সেই আল্লাহই কী আপনাকে আমাদেরকে মূর্তিপুজা বা মূর্তির ইবাদত বন্ধ করার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন; যেই মূর্তি ইবাদত আমাদের বাপ-দাদারা করে আসছিলো? এবং সেই আল্লাহই কী আপনাকে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক না করে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন? আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তর দেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, আল্লাহই আমাকে এসকলের আদেশ প্রদান করেছেন।

বেদুইন লোকটি পুনরায় বললো, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আপনাকে নাবী হিসেবে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহই কী আপনাকে আমাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত আদায়ের নির্দেশ দিতে বলেছেন? আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! তিনিই আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত আদায় করার নির্দেশ দেয়ার জন্য। তারপর সেই বেদুইন আবার আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলো, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আপনাকে নাবী হিসেবে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন? আল্লাহই কী আপনাকে আমাদেরকে রমজান মাসে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতে বলেছেন? আল্লাহই কী আপনাকে আমাদেরকে আমাদের সম্পদসমূহ

পবিত্র (সম্পদের যাকাত প্রদান) করার নির্দেশ দিতে বলেছেন? আল্লাহর রসূল ﷺ উত্তরদেন, হ্যাঁ! আল্লাহই আমাকে এসকলের আদেশ প্রদান করেছেন। এভাবেই আগন্তুক বেদুইন লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ কে ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং ফরজ কর্তব্যগুলোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলো। যতবারই বেদুইন লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ কে নতুন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ততবারই আল্লাহর রসূল ﷺ হ্যাঁ, জবাবের মাধ্যমে তার উত্তর প্রদান করেছেন।

এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনে (২২৬) প্রশ্ন ছিলো, ততক্ষন পর্যন্ত সে প্রশ্ন করতে থাকলো। অতপর বেদুইন লোকটি বললো, আমি যামাম ইবনে ছালাবাহ, বকর ইবনে ছাদ এর ভাই এবং আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আপনার নিকট বার্তাবাহক আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রছূল। আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, আপনি আমার কাছে যে বিষয় গুলো উল্লেখ করেছেন; আমি তাতে কোনো কিছু বৃদ্ধিও করবো না এবং তা থেকে কমও করবো না।

তখন নবী মুহাম্মদ ﷺ তাকে বললেন, তাহলে তুমি (যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দেয়া বক্তব্যের উপর টিকে থাকবে) সফলকাম। তারপর বেদুইন লোকটি সেখান থেকে চলে গেলো। তখন নবী ﷺ তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, দুই ঝুটিওয়ালা সফলকাম । যদি তার কথার উপর সত্য ও অবিচল থেকে থেকে। (ছহিহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হা ৪৬; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হা-১১, ১২; আবু দাউদ, হা-৩৯২, ৩২৫২; সুনানে নাসাঈ, হা- ৪৫৭, ২০৮৯, ৫০৩৪)

অতএব আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে তার এই সল্প সময়ের সাক্ষাতের পর বেদুইন লোকটি অর্থাৎ যামাম ইবনে ছালাবহ (রঃ) চলে গেলেন। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর সান্নিধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে তার এই স্বল্প সময়ের ভিতরে তিনি নিজেকে কল্যাণে ভরপুর করে নিয়েছেন। এই স্বল্প সময়ের ভিতরে তিনি নিজেকে সফলকাম করে তুলেছেন। এর কারণ এইযে, তিনি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে আগমন করে ছিলেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরবার থেকে উঠে গিয়ে তিনি নিজের উটের রশি খুলে এর উপর সওয়ার হয়ে সোজা ওয়াদীরে নোমান এর দিকে রওনা করলেন, তার বাড়ির পথে তার এই যাত্রা ছিলো ২০ দিনের। ১০ দিন লেগেছে মদিনায় আসতে আর ১০ দিন লেগেছে মাদিনা থেকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছাতে তিনি নিরাপদে তার উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছালেন, আর তখনকার সময়ে এটি খুব কঠিন কোনো ব্যাপার ছিলো না, তিনি যখন তার ঘরে ফিরে গেলেন, তার স্ত্রী দেখে অত্যন্ত খুুশি হলো এবং তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু যামাম (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে তার কাছে আসতে নিষেধ করলো এবং তার থেকে দূরে থাকার জন্য তাকে বললো। আর অভিশাপ দিতে লাগলো- লাত ও উজ্জা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক।

তার স্ত্রী তার এই কথা শুনে সবিসুরে জিজ্ঞেস করল, তুমি এসকল কি বলছো? হে যামাম ; তুমি কেন লাত ও উজ্জাকে নিয়ে এসকল কথা বলছো, তুমি কি তোমার ব্যাপারে কুষ্ঠ রোগ হওয়ার ভয় করোনা? তার স্ত্রী তাকে এই কথাগুলো বলছে, এই কারণে যে, তখন আরবে অজ্ঞতার কারনে এই কথা বিশ্বাস করতো যে, যদি কেউ লাভ ও উজ্জাকে গালি দেয়, সে এই রোগে আক্রান্ত হবে। যামাম (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে বললো, এই মুর্তিগুলোর না কোনো উপকার করার ক্ষমতা আছে আর না কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে।

সে তাঁর স্ত্রীকে এই বিষয়গুলো নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে একত্ববাদের ছায়া তলে আনতে পারেননি। এক পর্যায়ে তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। এরপরই যামাম (রাঃ) তার পিতার ঘরের দিকে গেলেন। তার পিতা তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু যামাম (রাঃ) তার স্ত্রীকে যা বলেছিল, তাই তার পিতাকে বললো; তার পিতা তাকে বললো, লাত ও উজ্জা তোমার প্রভূ, তোমার বাপ দাদা ও পূর্বপুরুষদের প্রভূ। যামাম (রাঃ) পুনরায় লাত ও উজ্জাকে অভিশাপ দিলো এবং তার পিতার সাথে এই বিষয়ে যুক্তির মাধ্যমে আলোচনা করতে লাগলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পিতা

ইসলাম গ্রহণ করেনি। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার পিতাকে বুঝাতে লাগলো । এক পর্যায়ে তার পিতাও ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

এরপরই যামাম (রাঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছে ছুটে গেলো এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহব্বান করলো, তাদের কাছে এই মূর্তিগুলোর ইবাদতের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। সূর্য উদয়ের পূর্বেই সকলেই ইসলামের ছায়াতলে এসে পড়লো। সুতরাং, হে আমার ভাই ও বোনেরা আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মানুষকে ডাকার ক্ষেত্রে যামাম ইবনে ছালাবাহ (রাঃ) এর কি গুনগত বৈশিষ্ট্য আপনারা দেখতে পান? আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবানের জন্য যামাম ইবনে ছালাবা (রাঃ) এর কি এমন যোগ্যতা এখানে কাজ দিয়ে ছিলো? তিনি কি ইসলামিক আইনের উপর মাষ্টার ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন? তিনি কি ইসলামিক দ্বীনের উসুলের উপর ডক্টরেট ছিলেন? তিনি কি আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার সদস্য ছিলেন? তিনি কি এই আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষিত কোন ব্যক্তি ছিলেন?

আল্লাহর কসম! তিনি কখনই কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ডিগ্রি অর্জন করেননি। তিনি সমাজের প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান অর্জন গ্রহণ করেননি। এমনকি তিনি আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলনেও অংশ গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে যদি আমাদের বলতে হয়, তাহলে আমরা একথাও বলতে পারি যে, তিনি এ বিষয়ে কোনো বইও কখনো পড়েননি, এমনকি এ বিষয়ে তিনি কোন লেকচার কারো থেকে শুনেননি, তিনি কখনো আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে কোনো খুৎবাহ শোনার সুযোগও পাননি। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর মুখে কোনো কুরআনের বানীও কখনো শুনেননি। এরপরও যখনই তিনি সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি যখনই নিজে একজন বিশ্বাসী হয়েছেন, তখন থেকেই তিনি মানুষকে বিশ্বাসী হিসেবে তৈরি করার জন্য কঠোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে গেছেন। (আল্লাহর দিকে আহব্বান, পৃ: ২০-২৯)

হে প্রিয় পাঠক! উপরে উল্লেখিত শায়েখের আলোচনা থেকে অন্তত এতটুকু তো অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, সত্য প্রচারক হবার জন্য কেমন ডিগ্রি অর্জনের

প্রয়োজন। সত্য প্রচারের জন্য মূলত বড় বড় ডিগ্রীর প্রয়োজন হয় না। সৎ সাহস ও আল্লাহর অনুগ্রহই যথেষ্ট। অথচ উল্লেখিত শ্রেনির লোকেরা আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই টানা-টানি করবে। যেন আপনার ব্যপারে জনসমাগমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়।

তবে আপনি ভেঙ্গে পড়বেন না, এটা নতুন কিছু নয়, এই শ্রেণির মানুষ এরুপ আচরণ আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথেও করেছে।

যেই বিষয়টি শাইখুল হাদিস আল্লামা শফিউর রহমান মোবারক পুরী (রহি:) আল্লাহর নাবী ﷺ এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর শিক্ষা দীক্ষার বিষয়াদি বিকৃত করে দেখানো, নাবী ﷺ এর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জনমতে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা ও অপপ্রচার করা, নাবী ﷺ এর শিক্ষ-দীক্ষা ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুকে অর্থহীন ও আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। এসবগুলো অনবরত এতো অধিক পরিমানে করা যাতে জন সাধারনে তাঁর দ্বীন প্রচারের দিকে ধীর স্থীর ভাবে মনোযোগ দেয়া কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না পায়।

মুশরিকরা যেমন কুরআন সম্পর্কে বলতো এসব অলীক স্বপ্ন, রাতে তৈরি করে আর দিনে সে তিলাওয়াত করে। সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে অর্থাৎ সে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়েছে ইত্যাদি। (আর রহিকুল মাখতুম, পৃ: **১১১**)

আল্লাহর রসূল ﷺ কে নিয়ে এমনি বাজে চিন্তা ও কর্ম ছিলো সেই শ্রেনির লোকদের মাঝে।

হে প্রিয় পাঠক! এখানেই শেষ নয়, যখন আপনি ইসলামের সত্য প্রচারক হবেন, তখন আপনার দেখা মিলবে সমাজ বা জনসমাগমে আরেক শ্রেনির মানুষের সাথে। যাদের কাজই হবে আপনার প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করা। অথচ আপনি সর্বদায় তাদের কল্যাণকামী। তাদের তখন নিকৃষ্ট আচরণ দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করবেন, তাদের এই ঘৃনিত আচরণের কারণটা কী? অথচ আপনি তো তাদের কোন ক্ষতি করেন না?

প্রিয় পাঠক! হ্যা, এটাও সত্য যে, আপনার পক্ষ থেকে তাদের কোন ক্ষতি হওয়া লাগবে না, আপনার দ্বারা তাদের ক্ষতি হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আপনি ইসলামের চুড়ান্ত সত্য কথাটি গোপন না রেখে তা প্রকাশ করেছেন, ফলে তাদের নেতৃত্বে ভাটা শুরু হয়েছে। এটাই আপনার অপরাধ। একারণেই তারা আপনার প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করবে। এটাও নতুন কিছু নয়; আপনি একবার ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আর রহিকুল মাখতুম এ শাইখুল হাদিস আল্লামা শফিউর রহমান মোবারক পুরী (রহি:) ছহিহ বুখারী থেকে একটি হাদিছ উল্লেখ করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নাবী করীম ﷺ বাইতুল্লাহর পাশে ছলাত আদায় করছিলেন, এমতোবস্থায় আবু জাহেল এবং তার বন্ধুবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি অন্যদের লক্ষ্য করে বললো, কে এমন আছে যে, অমুকের বাড়ি থেকে উটের ভুড়ি আনবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ যখন ছলাতরত অবস্থায় সিজদায় যাবে, তখন তার পিঠের উপর ভুড়িটি চাপিয়ে দিবে। ঐ সময় আরববাসীগনের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি উক্কবা বিন আবী মু'তইন উঠলো এবং কথিত ভুড়িটি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকলো। যখন নাবী কারীম ﷺ সিজদায় গেলেন, তখন সেই দুরাচার নরাধম ভুড়িটি নিয়ে গিয়ে তাঁর পিঠের উপর চাপিয়ে দিলো। আমি সব কিছুই দেখছিলাম, কিন্তু কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিলো না। হায় যদি আমার মধ্যে তাঁকে বাঁচানোর কোনো ক্ষমতা থাকত। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) আরো বলেন, এরপর তারা আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি, পাড়াপাড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিলো। মনে হলো এদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। হায় আফসোস! যদি তারা একটু বুঝত যে, কী সর্বনাশের পথ তারা বেছে নিয়েছে। একদিকে অর্বাচিনের দল যখন দানবীয় আনন্দ ও নারকিয় কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তখন দুনিয়ার সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ সিজদারত অবস্থায় বেহেশতী আবেহায়াত পানে বিভোর ছিলেন। কি অদ্ভুত বৈপরীত্য।

নাবী কন্য ফাতিমা (রাঃ) এ দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখানে আগমন করেন এবং ভুড়ি সরিয়ে পিতাকে তার নিচ থেকে উদ্ধার করেন। (আর রহিকুল মাখতুম, পৃ: ১২৪-১২৫)

হে প্রিয় পাঠক! এখানেই শেষ নয়; ছহিহুল বুখারীতে জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত এক বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে মুশরিকরা নাবী ﷺ এর উপর সব চেয়ে কঠিন যে নিপীড়ন চালিয়ে ছিলো তা আমার সামনে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, একদা নাবী ﷺ কা'বা গৃহের 'হাতীমে' ছলাত পড়ছিলেন, এমন সময় উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব সেখানে আগমন করলো। সে সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজ কাপড় দ্বারা তাঁর গ্রীবা ধারন করে অত্যন্ত জোরে চোড় থাপ্পর মারলো এবং গলাটিপে ধরলো। এমন সময় আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং উক্বাবার দু'কাধ ধরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে দুরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা মানুষটিকে এজন্যই হত্যা করছো যে, তিনি বলেছেন যে, আমাদের প্রভু আল্লাহ। (ছহিহ বুখারী মক্কার মুশরিকদের নাবী ﷺ এর প্রতি উৎপিড়ন অধ্যায়, ১, খÐ, পৃ: ৫৪৪)

আসমার বর্ণনায় অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এ আওয়াজ পৌছালো যে, 'আপন বন্ধুকে বাঁচাও' তিনি তখন অত্যান্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে আমাদের মধ্যে থেকে বের হলেন। তাঁর মাথার উপর চারটি ঝুঁটি ছিলো, যাবার সময় আবু বকর (রাঃ) বলতে বলতে গেলেন তোমরা মানুষটিকে শুধু একারণে হত্যা করছো যে, তিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ।

এরপর মুশরিকরা নাবী কারীম ﷺ কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর (রাঃ) এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তাঁর অবস্থা ছিলো এরুপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্যে থেকে যে ঝুঁটিটি ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে উঠে আসছিলো। (আর রাহিকুম মাখতুম, পৃ: ১৩৬, মুখতাসারুল সীরাহ, শাইখ আব্দুল্লাহ, পৃ: ১১৩)

হে প্রিয় পাঠক! একটি বার ভেবে দেখুন, এমন মহা মানব যিনি ছিলেন গোটা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত। এমন একজন ব্যক্তিকে শুধু সত্য প্রচারের জন্য কত আঘাত করেছে ঐ সকল নরাধামরা। আর আমি/আপনিতো এমন মর্যাদাবান কেও নই, তাহলে সত্য প্রচার করতে গিয়ে আমাদের কি অব্স্থা হতে পারে?

হে প্রিয় পাঠক! একথা ভাববার চেষ্টা করবেন না যে, সেই সময়ে কাফেররা সুন্দরমত শ্রেষ্ঠ দ্বীন ইসলামকে চায়নি, তাই তারা এমন বিরোধীতা করেছে। কিন্তু তখনতো সবাই চায় এমন সুন্দরতম শ্রেষ্ঠ দ্বীন ইসলাম আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত হোক। কেননা সেই সময়ের দ্বীন ইসলাম যেমন সত্য ও সঠিক, ছিলো শক্তিশালি। আপনিও যেই দ্বীন ইসলাম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন সেটাও তেমনি সত্য ও শক্তিশালী। আর যেটা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা প্রকৃত ইসলাম নয়। মনে রাখবেন, প্রকৃত ইসলাম বিচার-বিভাগে বেইনসাফী দেখে কখনোই চুপকরে বসে থাকতে পারে না। প্রকৃত ইসলাম কখনোই চুপ করে বসে থাকতে পারবে না, যখন দেখবে ওই জাতি যেনা-ব্যভিচার করতে করতে একেবারেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছে গেছে। প্রকৃত ইসলাম কখনোই চুপ করে বসে থাকবে না যখন দেখবে একটি মুসলিম ভু-খন্ডে যাকাতকে বাতিল করে, সুদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অন্যায় দেখে প্রকৃত ইসলামের গর্জন প্রথমেও যেমন তীব্র ছিলো ঠিক আগামীতেও তেমনই তীব্র থাকবে। প্রকৃত ইসলামের কোন পরির্বতন নেই। অতএব যখনই আপনি প্রকৃত ইসলামের সত্য প্রচারক হবেন, ঠিক তখনই ঐ সকল শ্রেনির মানুষগুলো একে একে আপনার সামনে এসে দাড়াবে আপনাকে বাধা দেবার জন্য। কিন্তু তাদের লেবাস আর চাল-চলন হতে পারে ভিন্ন। কখনো সমাজের বিত্তশালী, কখনো আলেম সেজে, কখনো সাধারণ মানুষ সেজে, কখনো বা আবার ইসলামী জিহাদী গুরুপের মুজাহিদ সেজে। এমন রং ঢং দেখে আপনাকে ঘাবড়ে গেলে চলবে না, আপনাকে শক্তভাবে দাড়িয়ে সামনেই অগ্রসর হতে হবে।

✍ সাধারন মানুষের মাঝে বিভিন্ন কটুক্তি মূলক কথা ছড়ানো:

হে প্রিয় পাঠক! আপনি যখন সমাজ বা জনসমাগমে সত্য প্রচারক হবেন, তখন আরেক শ্রেনির লোকের সাথে আপনার সাক্ষাত হবে যারা আপনার বিরুদ্ধে মানুষের মাঝে বিভিন্ন কথা বলে আপনার প্রতি মানুষের মনে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। যারা সকল সময়ে আপনার পেছনেই পড়ে থাকবে। কথা ও কাজের মাধ্যমে আপনার থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারাই যেন তাদের জীবনের স্বার্থকতা। যেমনটি তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সময়েও করেছে। তাদের কথা শাইখুল হাদিস আল্লামা শফিউর রহমান মোবারক পুরী (রহি:) এ ভাবে নিয়ে আসেন যে- কাফেররা যেভাবে তুফাইল বিন আমর দাওসী (রাঃ) কে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলো, তারা তুফাইল (রাঃ) কে বলেছিলো, হে সম্মানিত মেহমান তুফাইল! আমাদের শহরে আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু একটি লোকের কারনে আমাদের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে নানা ধরনের নতুন নতুন কথাবার্তা বলে, আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। আমাদের একতা নষ্ট করছে এবং শৃংখলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। তাঁর কথাবার্তা অনেকের উপর যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করছে। সে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়ে দিচ্ছে।

অতএব আপনি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলবেন না, কিংবা তাঁর কোনো কথাও শুনবেন না। (আর রাহিকুল মাখতুম, পৃ: ১৮০)

হে প্রিয় পাঠক! এমন নানা কথার ফুলঝুড়ি সাজিয়ে তারা জনসমাগমে বা সাধারন মানুষের নিকট পৌছাবে- যেই কথাগুলোর চাকচিক্য দেখে অনেক মানুষই তা গ্রহণ করে নিবে। কিন্তু আপনার কাজ নিয়ে আপনাকে সামনেই এগোতে হবে। এমন কিছুর দিকে তাকানোর চেষ্টা করলে আপনি সামনে অগ্রসর হতে পারবেন না।

✍ মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলতে হবে:

হে প্রিয় পাঠক! আপনি যখন ইসলামের সত্য কথাটি প্রচার করবেন অর্থাৎ আপনি সত্য প্রচারক হবেন তখন আপনার সমাজ বা জনসমাগমে আরো এক শ্রেণির লোকের সাথে সাক্ষাত হতে পারে। যারা নিজেকে জ্ঞানী বা বিত্তশালী লোক মনে করবে এবং আপনাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে কথার মাধ্যমে আটকানোর চেষ্টা করবে। তারা নিজেদের মান-ইজ্জতের পরোয়া করবে না। আপনার মান-উজ্জত নষ্ট করার জন্য সর্বদা আপনার পেছনে লেগে থাকবে। আপনি এমন লোকদের থেকে অবশ্যই দুরে থাকার চেষ্টা করবেন।

এরা যদিও নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু প্রকৃতই তারা মূর্খ লোক। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

অর্থ: তুমি ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খলোকদেরকে এড়িয়ে চলো। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৯৯)

হে প্রিয় পাঠক! একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যখন আপনি প্রকৃত সত্য প্রচার করবেন তখন সমাজ বা জনসমাগমে আপনার শত্রুর অভাব হবে না।

''মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই হেফাজত করুন এবং সত্য বুঝে সত্য প্রচার করার তাওফিক দান করুন''। (আমিন)

সমাপ্ত